বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক

প্রবর্ত্তিত

৫২ বর্ষ

১৩২২ সাল

(বৈশাখ হইতে চৈত্র)

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়

৩৯ নং এণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ২॥৶৹ ; যাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০

বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

১৩২২ সাল, ৫২ বর্ষ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 621. May, 1915.

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২১ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩২২। মে, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আ:	বু	শ	বু	শ	বু	শ
শে:	৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
	শু	স	শু	ম	শু	র
+	A	M	J	Jy.	Au.	S
‡	14	15	16	17	18	18
আ:	বু	শ	ম	বৃ	র	বু
শে:	30	31	30	31	31	30
	শু	সো	বু	শ	ম	বৃ

বু	শ	বু	শ	বু	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু: এ:,	১২	১১	৮	৭	৪	২
পূ:,	১৬	১৪	১২	১০	৭	৬
কৃ: এ:,	২৬	২৫	২৩	২১	১৯	১৭
অ:,	১,৩১	২৯	২৭	২৫	২৩	২১

আ:—আরম্ভ। শে:—শেষ।
শু: এ:—শুক্ল একাদশী, পূ:-পূর্ণিমা
কৃ: এ:-কৃষ্ণ একাদশী, অ:-অমাবস্যা

*** ১২ই বৈশাখ রবিবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্ল একাদশী।

১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ণিমা।

২৬শে বৈশাখ রবিবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী।

১লা বৈশাখ বুধবার, ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার এবং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২২ সাল।
ফসলী ১৩২২—২৩।
হিজরী ১৩৩২—৩৩।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৫—১৬।
শকাব্দ ১৮৩৭।
সংবৎ ১৯৭২—৭৩।
মগী ১১৭৭—৭৮।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৬—৮৭।

§	১	৮	১৫	২২	২৯
	২	৯	১৬	২৩	৩০
	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	৪	১১	১৮	২৫	৩২
	৫	১২	১৯	২৬	
	৬	১৩	২০	২৭	
	৭	১৪	২১	২৮	

* বৈ-বৈশাখ বুধবার আরম্ভ ও ৩১শে শুক্রবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

+ A-এপ্রেল, আরম্ভ বৃহস্পতিবার ও শেষ ৩০শে শুক্রবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতিবার, ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ বুধবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ শনিবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আ:	সো	বু	শু	শ	র	ম
শে:	৩০	৩০	২৯	২৯	৩০	৩১
	ম	বৃ	শু	শ	সো	বৃ
	O	N	D	J	F	M
	18	17	17	15	13	14
আ:	শু	সো	বু	শ	ম	বু
শে:	31	30	31	31	29	31
	র	ম	শু	সো	ম	শু

সো	বু	শু	শ	র	ম
ম	বৃ	শ	র	সো	বু
বু	শু	র	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
শু	র	ম	বু	বৃ	শ
শ	সো	বু	বৃ	শু	র
র	ম	বৃ	শু	শ	সো

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু: এ:,	২	১	১	১	২	২
পূ:,	৫	৫	৫	৬	৭	৬
কৃ: এ:,	১৭	১৭	১৬	১৭	১৭	১৬
অ:,	২১	২০	২০	২০	২১	২০

*** ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ১লা অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্ল একাদশী। ৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার ও ৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ণিমা।

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২১শে কার্ত্তিক রবিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষ।

শ্যামল সুন্দর সাজে বরষ নূতন!
ধরণীকে পরায়েছ নবীন বসন।
শুষ্ক তরুরাজি অই তোমার পরশে,
কিশলয়ে দেহ ঢাকি কি শোভা বিকাশে।
ভাই বোন এস সবে চল হাত ধরি,
শোক-তাপ যাতনার অশ্রু পরিহরি,
নূতন আহ্বান-গীতি কানে অই পশে,
নবীন-বরষ-রবি কি শোভে আকাশে।
গভীর কৃতজ্ঞভরে অবনত শিরে,
তাঁহারি আশীষ মাগি চল এ সংসারে।
পশ্চাতে ফিরিলে শুধু শ্মশান-অনল
যাহা হেরি ভগ্ন-প্রাণ হ'বে হীনবল।
নব ভাবে নব বর্ষে ডাক সমাদরে,
সুনব ভাবেতে সাজ উৎসাহের ভরে।
ভাঙা বীণা হাতে লও, বাজুক সুতান
হয়ত পাইতে পার নূতন জীবন।
শ্যামল-প্রকৃতি-মুখ নিখুঁত সুন্দর
হেরিয়া জাগুক প্রাণে আশা স্তরে স্তর।
(প্রভোঃ!) অই কিশলয় মত নবীন ভূষণে
ভূষিত করহ আজি আশাহীন প্রাণে।
অসীম দুঃখের মাঝে শির নোঙাইয়া
তোমারি পথেতে যেন যাই হে চলিয়া।
এনেছ অভাগী তরে, বরষ নূতন!
কেবলি কি কুহেলিকা আঁধার ভীষণ।
যাও দূরে সরে যাও চাহিনা পরশ,
তোমার মুরতি হেরি পরাণ অবশ।
ধরণী আলোক-স্নাতা শ্যামল-বসনা,
আমা তরে শুধুই কি অসীম যাতনা?
এতকাল ছড়ায়েছ কত সজীবতা
তোমার পরশে দূরে যেত সব ব্যথা।
ভগ্নতরী সুবাতাসে দিতাম ছাড়িয়া
(হায়!) এখনও বিশ্বাসহীন এ বিচূর্ণ হিয়া।
তোমার মুরতি হেরি প্রাণ যে বিকল
ধরণী আঁধারে ঢাকা অশ্রুই সম্বল।
বড়ই অধীর প্রাণ খুলিনা দুয়ার,
চিররুদ্ধ এ মরণ-তমসা-আগার।
নবীন-বরষ-রবি ঢালে যেন মসী,
শুধুই তমসাময় হেরি দশ দিশি।
যে শুভ্র আলোক হাসি নয়নে হেরিয়া
আমার দেউটী প্রাণে উঠিত জ্বলিয়া,
সংসারের তাড়নাতে না পেতাম ভয়,
বিশ্বাসের সেই আলো আজি কোথা হায়!
গেছে নিভে চিরতরে আলোক আমার,
নব বর্ষ! এ জীবন চির অন্ধকার।
অতীত ভাবিয়া হয় পরাণ পাগল,
বিশুষ্ক নয়নে নাহি ঝরে অশ্রুজল।
কঠোর নিয়তি মোরে নিয়ে কোথা যাবে,
কত দিন এ আঁধারে ঘুরিতে বা হবে?
কে বলিয়া দিবে বর্ষ! বিধির বিধান,
একাকী গণিতে হবে চক্র-আবর্ত্তন।

নব নব প্রকার নব বর্ষের অভ্যর্থনা।

আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় প্রায় সকল দেশেই নববর্ষের অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসবের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই উৎসব-প্রথা বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ সূর্য্য ঠিক যে সময়ে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই অনুসারে বস্ত্র পরিধান করিত। গভীর রাত্রিতে হইলে কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যাহ্নে হইলে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ,ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্য সময়ে হইলে তাহার উপযুক্ত রঙের বস্ত্র ব্যবহার করিত। রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত 'নোয়ারোজের' বস্ত্র পরিধান করিত। রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্য ও প্রজাদিগের নিকট হইতে নজর গ্রহণ করিতেন। "মাবারথ নোয়ারোজ" নব বর্ষের জয় হউক এই বলিয়া সকলে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিত। রাজা প্রথম ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। সমস্ত দিন আমোদে অতিবাহিত হইত। রাজ-প্রাসাদে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য মেলা হইত এবং পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ও তত্ত্ব তল্লাস হইত। স্ত্রীলোকেরা বহু পূর্ব্ব হইতে শিল্প-কার্য্যাদি প্রস্তুত করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

প্রাচীন রোমকেরা নববর্ষের প্রথম দিনে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিত। প্রজারা ভূস্বামীদিগকে সোণার পাতে মুড়িয়া খর্জ্জুর ও অন্যান্য ফল ভেট দিত এবং দেবমূর্ত্তি ক্রয় ও তাহার পূজার নিমিত্ত টাকা ব্যয় করিত। ইউরোপের উত্তরাংশের লোকেরা থর ও ওডিন দেবতার পূজা করিত। তাহারা কাষ্ঠ জ্বালাইয়া, বলি দিয়া, দেবতার স্তব গান করিয়া, নূতন বৎসরের প্রারম্ভে মহা আনন্দ লাভ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের শুভকামনা করিত। ড্রুইড নামে ইংলণ্ডের প্রাচীন ধর্ম্মযাজকেরা অরণ্যের বৃহৎ ওক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রৌপ্য-ছুরিকা দ্বারা তাহা হইতে পবিত্র লতা বিশেষ ছেদন করিত এবং তাহাই সকলে নববর্ষের উৎসব বলিয়া বিবেচনা করিত। রোমক, স্যাক্সন ও দিনামারেরা যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করে, তখন তাহারা ইংলণ্ডে নববর্ষের আনন্দ প্রকাশ করিত। নর্ম্মান রাজারাও ইহার অন্যথা করেন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় হেনরী নববর্ষের তোলা তুলিতেন। অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়েও নববর্ষ উপলক্ষে রাজকীয় দানের রীতি ছিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীরাও যথেষ্ট অর্থ-সংগ্রহ করিতেন।

ইংলণ্ড ও আইসলণ্ডে নববর্ষের দিনে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভজনালয়ে উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। স্কটলণ্ডে

নববর্ষের উৎসব ইংরাজদিগের বড় দিনকেও পরাস্ত করে।

চীনদেশে নববর্ষের দিনে ধূমধামের সীমা থাকে না। নূতন বৎসর না পড়িতে পড়িতেই পুরাতন বৎসরের সমুদায় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম। বৎসরের শেষ মাসের মধ্যে ব্যবসায়ী লোকে দেনা পাওনা পরিষ্কার না করিলে ঘোরতর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। গত বৎসরের সমুদায় ভাবনা চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকে মহা আনন্দে উৎসব করে এবং বহুল পরিমাণে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় চীনদেশের বণিকেরা দোকান সকল পুষ্পদ্বারা সজ্জিত ও আলোক-মালায় মণ্ডিত করে এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে নব বর্ষের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব। দোকান সকলে ঘোর রোলে কোলাহল উত্থিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নববর্ষের দান প্রদান ও গ্রহণ করে। জর্ম্মনিতে এই দিনে ঘণ্টা-ধ্বনি, তোপ-ধ্বনি, নৃত্য-গীত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি চলিয়া থাকে। ল্যাপল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ডেন্মার্কে নববর্ষের সময় অত্যন্ত শীত, তথাপি তাহারা গৃহমধ্যে মহোৎসব করিয়া থাকে। সুইজার্লাণ্ডে শিঙ্গা বাজে এবং কৃষকেরা পর্ব্বতোপরি একত্র হইয়া আনন্দধ্বনি করে। আমেরিকার লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে, গৃহস্বামিনীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে ও পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া সুরাপান করে।

নববর্ষের অভ্যর্থনা উপলক্ষে মনুষ্যজাতি সর্ব্বত্র এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহজনক উৎসব করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদিগের জীবন গত বর্ষের ক্লান্তি, অবসাদ ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যম ও বল সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

বড়-বৌ।

১

"মা! এই ওষুধ টুকু খাও!"

"আর আমায় ওষুধ দিওনা মা।"

"কবিরাজ মশাই বলে গেছেন, ঠিক নিয়ম-মত ওষুধ দিতে। তা না হ'লে আমাকে বক্‌বেন।"

"আর ওষুধে কি হবে মা! যাকে কালে ধরেছে, তার পক্ষে ওষুধের চেয়ে পরকালের ভাবনায় বেশী কাজ হবে।"

"মা! অমন নিষ্ঠুর কথা বলো না। তা হ'লে আমি যাবো কোথায়?"

"আমার নরেন বেঁচে থাক, তোমার

দেওরেরা ভাল থাক, তোমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক। ও কথা বলতে আছে পাগলি ?"

"আর বলবো না মা। আমার কথা শোন। কবিরাজ-কাকা বলে গেছেন, এই ওষুধটা না খেলে আবার তোমার জ্বর বাড়বে।"

ঔষধের খলে বড়ী মাড়িয়া, সেই খল-খানি হাতে লইয়া রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, বধূ তাহার শশ্রূকে উল্লিখিত ভাবে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিতে-ছিল। বধূর নাম—স্বর্ণকুমারী।

কুন্দগ্রাম একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। চারি দিকে মাঠ, জলা ও ধান-ক্ষেত। মধ্যে মধ্যে বাগান ও বসত পল্লী। গ্রামের মধ্যে কয়েকটী বড় বড় দীর্ঘিকা। গ্রামের জমীদার মিত্র বাবুরা এই দীর্ঘিকাগুলি খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। মিত্র বাবুরা কায়স্থ। তবে অবস্থা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, তাঁহাদেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।

এই গ্রামটী কয়েকটী পল্লী বা পাড়ায় বিভক্ত। গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসই কিছু বেশী। সর্ব্বসমেত পাঁচ সাত শত ঘর লোক এই গ্রামে বাস করে। ব্রাহ্মণেরা যে পল্লীতে বাস করিতেন, তাহা ব্রাহ্মণ-পাড়া বলিয়া পরিচিত। এইরূপ কায়েত-পাড়া, বৈদ্যপাড়া প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী-বিভাগ ছিল।

এই কুন্দ গ্রামের একটী ব্রাহ্মণ-পল্লীতে রামনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাসভবন। বাসভবন বলিলাম বলিয়া, পাঠক-পাঠিকা যেন মনে না ভাবেন, তাহা একটী দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই বাসভবন, একতালা পাকা বাড়ী। সেই বাড়ীর চারি দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে একটী প্রশস্ত উঠান। উঠানের পূর্ব্ব প্রান্তে চারিটি সারি সারি দোহারা কামরা।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। দশ বৎসর হইল, তিনি পর-লোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও লোকে তাঁহার তেজোদৃপ্ত মুখমণ্ডল, ত্রিপুণ্ড্রক-ভূষিত প্রশস্ত ললাট-দেশ, ব্রহ্মণ্যতেজঃপূরিত সমুজ্জ্বল কান্তি ভুলিতে পারে নাই। তিনি স্বাধীনচেতা, স্পষ্ট-বাদী ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লোভী ছিলেন না। গ্রামের লোকে কোন বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আসিত। তিনিও বিবেচনা করিয়া এরূপ ভাবে পরামর্শ দিতেন যে, তাহাতে তাঁহাদের কাজ উদ্ধার হইয়া যাইত।

সার্ব্বভৌম মহাশয়, অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহার যজমান। মিত্র-বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্মাদি উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিতেন বটে, কিন্তু কখনও তাহাদের দান গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম নরেন্দ্র। মধ্যম ও কনিষ্ঠের নাম সুরেন্দ্র ও ধরেন্দ্র। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আমলে, সংসারের স্বচ্ছলতা ছিল বলিয়া কোন জিনিসের কখনও অভাব হইত না। যজমান-প্রদত্ত বৃত্তি ও দক্ষিণা প্রভৃতিতে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

ইহা ছাড়া দুই চারি খানি বাগানবাড়ীও তাঁহার ছিল। বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, প্রভৃতি তাঁহার পুণ্যফলে এত বেশী জন্মিত যে, তিনি তাহা প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াও স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই তিন পুত্র ব্যতীত, মহামায়া বলিয়া তাঁহার এক কন্যা ছিল। এই মহামায়া, নরেন্দ্রের পরবর্ত্তিনী। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর সময় নরেনের বয়স ছিল কুড়ি বৎসর। মহামায়ার বয়স পনর বৎসর। মহামায়া সৎপাত্রেই অর্পিতা হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়, নিজে কন্যাকে সুশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সে সুশিক্ষা পুস্তকগত নহে, নীতি ও উপদেশমূলক। তিনি কন্যাকে পাখী পড়ানর মত সর্ব্বদা বুঝাইতেন—"মা! পরের ঘরে তুমি যাইবে। বিবাহের পর পিত্রালয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ খুব কম থাকিবে। তুমি আমার উপদেশ মত কাজ করিও, আমার শিক্ষা মত জীবনেকে পরিচালিত করিও। যে সংসারে তুমি যাইবে, তাহা সোনার সংসারে পরিণত করিবে। মনে কেবল দুইটী কথা রাখিবে—ক্ষমা ও ধৈর্য্য, স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ। স্বামিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। পরিজনমধ্যস্থ কাহারও উপর হিংসাদ্বেষ প্রকাশ করিবে না। স্বধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাস রাখিবে।"

মহামায়া পড়িয়াছিলও খুব ভাল ঘরে। আর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শিক্ষা-গুণে মহামায়া যে সংসারে গিয়াছিল, তাহা সত্য সত্যই সোনার সংসার হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে পিতার অনুগত ছিল। কালধর্ম্মে বাধ্য হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়, নরেন্দ্রকে গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র অতি মেধাবী, পাঠে তার খুব অনুরক্তি। এই জন্য সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা জলপানী পাইল ও কলিকাতায় এলে পড়িতে গেল।

নরেন্দ্র যেবার এলে পরীক্ষা দিবে, সেই বৎসর পরীক্ষার মুখোমুখী সময়ে কলেরা রোগে সার্ব্বভৌম মহাশয় সহসা দেহত্যাগ করেন। এই পিতৃবিয়োগ-ব্যাপারে নরেন্দ্র বড়ই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র পিতৃগত-প্রাণ—সুতরাং তাহার প্রাণে পিতৃশোকটা বড়ই আধিপত্য বিকাশ করিল।

তখন অতবড় একটা বৃহৎ সংসারের ভরণ-পোষণ-ভার তাহার স্কন্ধে। দুইটী নাবালক ভাই—তাহাদিগকে মানুষ

করিতে হইবে, লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। সংসারের খরচও ঢের। এ পুণ্যের সংসারে অনেক আশ্রিত লোকে অন্ন পাইত। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দেহান্তের সহিত, কয়েক জন আশ্রিত ব্যক্তি সংসারের অবস্থা দেখিয়া আপনি আপনি সরিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিবাহিত। যে বৎসর সে এণ্ট্রান্স্ পাশ হয়, সেই বৎসর সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার বিবাহ দেন। নরেন্দ্রের পত্নীর নাম স্বর্ণকুমারী।

নামও যা—এই স্বর্ণকুমারী রূপেও সেইরূপ। সে পল্লীমধ্যে স্বর্ণকুমারীর মত রূপবতী বধূ খুব কম ঘরেই ছিল। স্বর্ণকুমারী এক অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাহার মতিগতি পিতৃ-মাতৃ-প্রদত্ত সুশিক্ষায় অনুপ্রাণিত। সার্ব্বভৌম-মহাশয়, এই রূপবতী ও গুণবতী পুত্র-বধূকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বালিকা বধূর কার্য্য-প্রণালী, গুরুজনে ভক্তি ও কর্ত্তব্যানুরাগ দেখিয়া, অনেক সময়ে গৃহিণীকে বলিতেন "আমার এই বড় বৌ হইতে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি হইবে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। নরেন্দ্র বড় বৌমার অদৃষ্টের গুণে ধনশালী হইবে।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। নরেন্দ্র রাতারাতি ধনশালী না হইলেও, সেই সময়ে সংসারে যেন সকল দিক দিয়া উন্নতি হইতে লাগিল। যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই সংসার উন্নতির দিকে সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্র স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এলে পাশ করার পর হইতে তাহাকে কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইবে। নরেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু পাঠ-সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বের সেই আগ্রহটা কমিয়া গেল।

নরেন্দ্রের ভাগ্যলক্ষ্মী, তখন তাহার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্না নহেন। সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই নরেন্দ্র ম্যাক্লিংটন কোম্পানীর আপিসে ত্রিশ টাকার একটী কর্ম্ম স্বীকার করিল। স্বর্ণকুমারীর ভাগ্য-গুণেই হউক, আর নিজের কৃতিত্বের জন্যই হউক, দুই বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্রের ষাট টাকা বেতন হইল। আপিসের অধ্যক্ষ সাহেবেরাও তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। কারণ, নরেন্দ্র আপিসের মধ্যে একজন খুব কাজের লোক।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর পর, পাঁচ বৎসর সুখে দুঃখে কাটিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের কোন পুত্র-সন্তানাদি হয় নাই। এজন্য গৃহিণী-ঠাকুরাণী বড়ই দুঃখিত। কিন্তু নরেন্দ্র, তজ্জন্য আদৌ দুঃখিত নহে। তাহার মা যখন বলিতেন "নরেন! আমার মনের বড় সাধ যে, নাতিকে কোলে করিয়া মনুষ্যজীবনের ও সংসারের

একটা প্রধান সুখ উপভোগ করি। কিন্তু দেখিতেছি বিধাতা আমাদের প্রতি এ বিষয়ে সদয় নহেন।" নরেন্দ্র এই কথায় লজ্জিত হইয়া কখনও বা স্থানান্তরে চলিয়া যাইত, আবার কখনও বা বলিত "দরিদ্রের সংসারে আসিলে সে শিশুত কোন সুখই পাইবে না মা। যে কষ্টে, বাবার মৃত্যুর পর, এই বৃহৎ সংসার চালাইতেছি, তাহার ত সবই তুমি জান।"

বস্তুতঃ নরেন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য খুব বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। এখন সে যাট্ টাকা বেতন পাইতেছে বটে, কিন্তু আগে ত তা ছিল না। ত্রিশটী টাকায় এত বড় একটা সংসার চালানো বড় শক্ত কথা। দুইটী ভাই, বিধবা মাতা, একজন দাসী, তার উপর অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্ব ত প্রায়ই লাগিয়া আছে। ইহার উপর আবার সামাজিক লোকলৌকিকতা ও কুটুম্বিতা। দিন কাল যেমন পড়িয়াছে, সেইরূপ বুঝিয়া মহামায়ার শ্বশুরবাটীতে পালেপার্ব্বণে তত্ত্ব তালাস করিতে হয়। কনিষ্ঠ দুইটী ভায়ের মধ্যে মধ্যমটী এণ্ট্রান্স পাস হইলে, নরেন্দ্র তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছে। কনিষ্ঠ বরেণ গ্রামের স্কুলে পড়িতেছে। স্কুলের মাহিনা ও কলিকাতার বাসাখরচ বড় কম নয়। কাজেই নরেন্দ্রকে "প্রাইভেট টিউসান" করিতে হইত। এইরূপে দুই তিন জায়গায় ছেলে পড়াইয়া সে মাসে আরও বিশ টাকা উপায় করিত।

বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে, নরেন্দ্র মাসিক যাট সত্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া এই সুবৃহৎ সংসার পালন করিয়া আসিতেছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শয্যাশায়িনী পত্নী নরেন্দ্রের জননীর সহিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারীর যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহার আভাস আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দিয়াছি।

সার্ব্বভৌম-পত্নী, নানাবিধ জটিল রোগে জীর্ণশীর্ণ ও শয্যাশায়িনী। নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে, তাহা বলিয়াছি। নরেন্দ্র মাতার জন্য কলিকাতার কোন নামজাদা কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দিয়াছে ও নিজ গ্রামের দক্ষ চিকিৎসক ভবনাথ সেন গুপ্তের হস্তে চিকিৎসার ভার দিয়া গিয়াছে। ভবনাথ "শতেকমারী বৈদ্য" নহেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞান ও চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তিনি ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের জীবদ্দশায়, তাঁহাকে প্রায়ই সুরেন্দ্রদের বাটীতে আসিতে হইত। সার্ব্বভৌম-মহাশয়কে তিনি দাদা বলিতেন, সার্ব্বভৌম পত্নীকে তিনি বধূ-ঠাকুরাণী বলিতেন। নরেন সুরেন ও বধূমাতা তাঁহাকে দেখিয়া কোনরূপ সংকোচও করিত না। কবিরাজ ভবনাথ, পূর্ব্বদিনে ঔষধব্যবস্থা করিবার সময় স্বর্ণকুমারীকে ডাকিয়া বলিয়া দেন—"দেখ বৌমা! তোমাকে গোপনে বলিতেছি, তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর রোগটী বড় সহজ নহে। একে

বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে এই ঘুসঘুসে জ্বর, তাহার উপর পেটের দোষও একটু আছে। এরূপ স্থলে খুব সাবধানে নিয়মিতরূপে ঔষধাদি খাওয়াইতে হইবে। আর এ ভার, তুমি ভিন্ন আর লইবেই বা কে ?"

কাজেই পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারী তাহার শাশুড়ীকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। পুত্রবধূর একান্ত পীড়াপীড়ি ও চোখে জল দেখিয়া গৃহিণী তাঁহার জেদ্ ত্যাগ করিয়া ঔষধ খাইলেন।

স্বর্ণকুমারী বলিল—"মা কবিরাজ-কাকা বলিয়া গিয়াছেন, আর দুই মোড়া ঔষধ আজ তোমাকে দিতে পারিলেই জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে—পেটের অসুখটাও থাকিবে না।"

গৃহিণী বলিলেন—"বৌমা! ডাক্তার-বদ্দিতে অনেক কথাই বলে থাকে। রোগ আরাম কর্ত্তে পারেন সেই ভগবান্। তা আমার রোগ সারুক আর নাই সারুক, তাতে বড় একটা আসে যায় না। তুমি সুরেনকে চিঠি লিখেছ কি? আজ কি বার? বৃহস্পতিবার না? যদি না লিখে থাক, তা হলে তাকে লিখে দাও, যেন সে মিছে পয়সা খরচ করে, আমার জন্য বেদানা প্রভৃতি না আনে। আমি ত খাইনা, ও গুলো পড়ে থাকে। আর তাকে লিখে দিও যেন সে তিন চারি দিনের ছুটী নিয়ে বাড়ীতে আসে। যে উপায়ে হোক্—শনিবারে যেন বাড়ী আসে।"

পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারী বলিল—"তুমি যা বলিলে সবই করিব। এখন আমি রান্না ঘরে যাই, উনুন জলে যাচ্ছে।"

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নবম অধ্যায়।

চৌক-মহল্লা।

পরবর্ত্তী মহল্লার নাম চৌক। ধর্ম্ম-সংক্রান্তই হউক বা বাণিজ্য-সংক্রান্তই হউক, ইহা বারাণসীধামের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার দক্ষিণ দিকে দশাশ্বমেধ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে নদী, উত্তর-পূর্ব্বে কোতোয়ালী, উত্তর দিকে জেইতপুরা এবং পশ্চিম দিকে চেতগঞ্জ। মহল্লাটী ক্ষুদ্র হইলেও সম্পূর্ণরূপে পাক্কা। এখানকার সমগ্র অধিবাসী জাতিতে হিন্দু। স্থানটি চৌক-রাস্তা দ্বারা দ্বিধাকৃত। বারাণসীধামের সুপ্রসিদ্ধ পট্টবস্ত্র এবং পিত্তলের বাসনের দোকান এই স্থানেই দেখা যায়। কারমাইকেল লাইব্রেরী পর্য্যন্ত এখানকার রাস্তাটি মন্দ বটে, কিন্তু তাহার পরই চৌক

পর্য্যন্ত ভাল। এখানে একটি সুন্দর পুলিশ থানা, নিচিবাগ, ঘণ্টা ঘর এবং দুই পার্শ্বে উত্তমোত্তম সৌধরাজি আছে। সিটি পোষ্ট অফিস এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্ক উক্ত অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত। নিচিবাগের সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য মন্দ বলিতে হইবে। ইহা চৌকের দাল-কি-মণ্ডি নামক রাস্তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। শেষোক্ত রাস্তাটী চেতগঞ্জের পশ্চিম দিক দিয়া নায়া চৌকের প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। নায়া চৌকে একটি মিউনিসিপ্যাল বাজার অবস্থিত। এখানে কাপড় এবং সাধারণ বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। নিকটেই পুরাতন হরহা সরাই নামক পান্থনিবাস। দাল-কি-মণ্ডি হইতে কাশিপুরা রাস্তা উত্তরবাহিনী হইয়া ধাবিত হইয়াছে এবং যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে লৌহ এবং স্বর্ণ রোপ্য নির্ম্মিত বস্তুর প্রধান বিপণি অবস্থিত। উত্তরে "গোলা দিন নাথ"। এখানে মসলা, তামাক ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। সমগ্র চৌক রাস্তার উত্তর পশ্চিম দিকটা বিপণি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে কতকগুলি বাজার আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল মাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত উপকরণাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। কচুরিগলি রাস্তা দক্ষিণবাহিনী হইয়া চৌক হইতে দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তদুপরি অনেকগুলি মিষ্টান্নের দোকান অবস্থিত। এখান হইতে যে রাস্তা রামঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকগুলি কিংখাপের দোকান আছে। বারাণসীর মধ্যে এই স্থানটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। কচুরিগলির উত্তর দিকে অন্য একটি রাস্তা পশ্চিমবাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর দিকের স্থানটী "থাথেরী" বাজার নামে খ্যাত। এখানে পিত্তলের বাসন আদির প্রধান আড্ডা। কচুরিগলির দক্ষিণ দিকটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মন্দিররাজি দ্বারা অধিকৃত এবং মধ্যে মধ্যে যে সকল দোকান অবস্থিত, তাহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি, যজ্ঞোপবীত এবং পূজার সামগ্রীনিচয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণমন্দির নামে খ্যাত মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং বারাণসীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশ্বেশ্বরের স্থান। কাশীর দেবতাদিগের মধ্যে বিশ্বেশ্বর রাজা। কোন কার্য্য করিতে হইলে তিনি নগরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের উপর হুকুম জারি করিয়া থাকেন। ভৈরবনাথ নগরের হাল বিশ্বেশ্বরকে অবগত করান। পঞ্চকোশী রাস্তার সর্ব্বত্রই কোতোয়ালের কর্ম্মচারিগণ অবস্থিত। যাহাতে দানবগণ নগর অধিকৃত করিতে না পারে তজ্জন্য তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্যটী অতি চমৎকার। এখানে মুণ্ডিত-মস্তক অথচ শিখাধারী ব্রাহ্মণগণ কপালে তিলক ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সন্ন্যাসিগণ বিলম্বিত জটাভার লইয়া নগ্ন বেশে গাঁজায় দম চড়াইতেছেন, সালঙ্কারা

রমণীরা পূজার উপকরণাদি লইয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন। পূজার উপকরণ সামগ্রী গুড়, তণ্ডুল, ঘৃত, ফুল, ফল ইত্যাদি। ফুলের মধ্যে রাঙ্গা পদ্ম। এখানে পদ্ম ফুলের পূজার বিশেষত্বের পরিচয় দিতেছে। দূর হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখিলে প্রথমে মহাদেবের মন্দিরের চূড়া নয়নপথে পতিত হয়, দ্বিতীয়তঃ গিল্টি করা গম্বুজ এবং তৃতীয়তঃ গিল্টি করা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। প্রাতে তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়াটী স্বর্ণপত্রের দ্বারা মণ্ডিত করেন। এখান হইতে বিনায়কনামক একটী অপ্রশস্ত গলি দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং এই গলিটীতে তীর্থযাত্রিগণ প্রত্যহ প্রাতে গমন করেন। ১১৯৪ খৃঃ সাহাবুদ্দিন ঘোরী দ্বারা ইহা বিচূর্ণীত হয়। অনতিবিলম্বে বর্ত্তমান মন্দির ও কারমাইকেল লাইব্রেরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্য একটী মন্দির গঠিত হয়; কিন্তু তাহাও ঔরঙ্গজেব দ্বারা বিধ্বংসিত হয়। এই চূর্ণীকৃত মন্দিরের সামগ্রী লইয়া তিনি একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রাচীরে অদ্যাপি হিন্দু শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদের অস্তিত্ব নিবন্ধন হিন্দুরা অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান মন্দির ও মসজিদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্ঞানবাপী নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ অবস্থিত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, জ্ঞানবাপীতে মহাদেব বাস করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, কোন সময়ে বারাণসী ধামে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। জলাভাবে জনসমাজের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে দেখিয়া একজন ঋষি মহাদেবের ত্রিশূল লইয়া মৃত্তিকা বিদ্ধ করেন, অমনি নীচে হইতে জল উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে মহাদেবের কর্ণে এই কথা পহুঁছিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই কূপে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির মুসলমানগণ ধ্বংস করে, তখন একজন ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি ম্লেচ্ছের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কূপে নিক্ষেপ করেন। হিন্দুগণ এই কূপে দলে দলে আইসে এবং ফুল বিল্বপত্র ও জল আদি দিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করে। কূপোদক অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। পুষ্পাদি অর্চ্চনা দ্রব্য পচিয়া পূতিগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। ১৮২৪ খৃঃ অঃ জ্ঞানবাপীর চতুষ্পার্শ্বে সিন্ধিয়া ঘাটের নক্সানবিশ গোয়ালিয়রনিবাসী বাজরবাই নামক জনৈক ব্যক্তি নিম্নছাদবিশিষ্ট স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে ঔরঙ্গজেবের মসজিদের পরেই আদি-বিশ্বেশ্বরের বহু পুরাতন মন্দির অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে পশ্চিম দিকে "কাশী করাইত" নামে একটি কূপ আছে। কূপোদক পর্য্যন্ত গমন করিবার রাস্তাও বিদ্যমান। পূর্ব্বে

একজন যোগী আপনাকে মহাদেবের নিকট বলি প্রদান করে। এইজন্ত ইংরাজ সরকার কূপটী বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পাণ্ডাগণের আবেদনে গভর্ণমেণ্ট প্রতি সোমবারে কূপটীকে খুলিতে আদেশ দেন। সন্নিকটস্থ স্থানটী মন্দিররাজি দ্বারা বেষ্টিত, তাহার প্রত্যেকটির বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই মন্দিরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ মন্দির-দ্বয়ের নাম সাক্ষীবিনায়ক এবং অন্নপূর্ণার মন্দির। তীর্থযাত্রিগণ পঞ্চকোশী রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া সাক্ষীবিনায়কের মন্দিরে আসিবেই আসিবে। নতুবা তাহাদিগের পরিভ্রমণের ফল হইবে না। সাক্ষী-বিনায়কের মন্দিরটী একজন মহারাষ্ট্রীয় দ্বারা নির্ম্মিত। জ্ঞানবাপীর পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ষাঁড় দণ্ডায়মান আছে। নেপালাধিপ এই ষাঁড়টী মহা-দেবের নামে দান করিয়াছেন। মন্দিরটী হায়দ্রাবাদের রাণী দ্বারা নির্ম্মিত। দক্ষিণ দিকে লোহার গরাদে দ্বারা একটি স্থান পরিবেষ্টিত। ইহার মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তর এবং অন্ত একটি সাধারণ প্রস্তর নির্ম্মিত দেবস্থান আছে। এই স্থানে দণ্ডায়-মান হইয়া উত্তরপশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ৬০ ফিট উচ্চ একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদ হইতে ইহা ৫০ গজ দূরে অবস্থিত। ইহাই আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। আমরা ইতি-পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি। অন্নপূর্ণা দেবী বারাণসীধামে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা। ইহাঁর অনুকম্পায় এখানে কেহই ক্ষুধায় কাতর হয় না। সকলেরই ইনি অন্নদাত্রী। প্রবাদ এইরূপ যে, বারা-ণসী ক্ষেত্রে সকলকে অন্নদান করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া অন্নপূর্ণা দেবী গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। গঙ্গাও উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থিরীকৃত হইল যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলেই গঙ্গা এক পাত্র জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। তদবধি যাহারা এই স্থান দর্শন করিতে আইসে, সঙ্গে করিয়া এক অঞ্জলি শস্য লইয়া আইসে। তাহার ফলে অনেক গরীব দুঃখীর প্রতিপালন হইতেছে। যে কার্য্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় সিদ্ধ হয় না, তাহা যদি ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয় তবে সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমক্ষে অনেক গরীব দুঃখীকে উপবিষ্ট দেখিবে। লোকের নিকট হইতে ইহারা ত ভিক্ষা পাইয়াই থাকে। তদ্ব্য-তীত পূজারিগণও লোকের নিকট হইতে গরীবদিগের জন্ত আটা শস্যাদি সংগ্রহ করে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের চবুতরার এক কোণে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। ইহাঁর রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত। সপ্ত রশ্মি ইহাঁ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া অবনীমণ্ডলে কিরণ দান করিতেছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে শুকরেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পুত্রকামী ব্যক্তিগণ পুত্রপ্রাপ্তির আশায় এই স্থানে আগমন করিয়া অপত্য কামনা করিয়া থাকে। শুকরেশ্বর সুন্দর পুত্র-দাতা। চৌক মহল্লায় বহুসংখ্যক আখড়া

আছে, তন্মধ্যে চৌক মহল্লার "বাড়ী-সংঘাত" নামক আথড়াটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা পাতিয়ালার মহারাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুসংখ্যক শিখের সেখানে আবাস। তেজ বাহাদুর নামক তৃতীয় শিখ গুরুর সম্মানার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

কোতোয়ালী মহল্লা।

চৌকের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে কেতোয়ালী অবস্থিত। পূর্ব্বে ভৈরবনাথের মন্দির ছিল বলিয়া এই মহল্লাটির নাম কালভৈরব ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গঙ্গা, উত্তরপশ্চিম দিকে আদমপুরা, উত্তরে জৈইত পুরা এবং উত্তরপশ্চিম কোণে চেতগঞ্জ। মহল্লা ভেদ করিয়া একটি রাস্তা চেতগঞ্জ হইতে রাজঘাট পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া মদয়াগিন নামক সরকারি বাগানের নিকট চৌক রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাস্তাটীর দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ পাকা। দুইটি গলি এই রাস্তার সহিত আড়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমটীর নাম চৌথম্বা এবং তাহা পূর্ব্বদিক হইতে থাথেরী বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। থাথেরী বাজারে "ধান তেরস" মেলা হয়। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে এই মেলাটি হইয়া থাকে। কুসীদব্যবসায়িগণ এই দিনে ধানের পূজা করিয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই দিনে ধাতুপাত্র ক্রয় করে। অন্য গলিটি শ্মশান ঘাট হইতে পূর্ব্বদিকে চৌথম্বায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রাস্তাটির উত্তর পূর্ব্বদিকে যে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী চারিটী স্তম্ভের উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই চৌথম্বা নামে প্রসিদ্ধ। এই নামেই রাস্তাটির নামকরণ হইয়াছে। নিকটেই রাস্তাটীর বহির্ভাগে একটী অপ্রশস্ত গলিতে, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী পুরাতন মস্‌জিদ অবস্থিত। মস্‌জিদটী চৌকোণা স্তম্ভের উপর স্থাপিত। চৌথম্বা এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোপাল মন্দির আছে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। মহল্লার দক্ষিণাংশের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানটীর নাম কালভৈরব মহল্লা। ইহাতে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ভৈরবনাথ সমুদায় বারাণসীর উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী পুনার পেশোয়া বাজীরাও দ্বারা নির্ম্মিত। ভৈরবনাথের বাহন কুকুর। ময়রারা চিনি দ্বারা কুকুরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। লোকে তাহাই ক্রয় করিয়া পূজা দিয়া থাকে। দ্বারের বাম দিকে একটি কুকুরের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার উপর বিষ্ণুর দশ অবতারের দশটী মূর্ত্তি চিত্রিত। উত্তর দিক দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সমক্ষে একটি ঘরে ঘণ্টাচতুষ্টয় বিলম্বিত দেখিতে পাইবে। একজন পুজারি বাম দিকে ও অন্য একজন দক্ষিণ দিকে ময়ূরপুচ্ছের একটী দণ্ড ধারণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ ও বালক নির্ব্বিশেষে যাত্রিমাত্রেরই উপর স্পর্শ

করায়। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা ভূতাদি পালাইয়া যায়। অবশ্য এই কার্য্যের জন্য পূজারিবর্গ লোকের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা একটি নারিকেল খোল এমন স্থানে রাখিয়া দেন যে তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাত্রিগণ তাহাতে পয়সা রাখিয়া দেয়। এই দেবস্থানটী দুইটী দ্বারপাল দ্বারা রক্ষিত। তাহাদিগের মূর্ত্তিও এই স্থানে স্থাপিত আছে। উক্ত রক্ষিদ্বয় "দ্বারপালেশ্বর" নামে খ্যাত। প্রাচীরগাত্রে ভৈরবনাথের ত্রিশূল অঙ্কিত। দেবস্থানের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাম্রনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র দেবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ভৈরবনাথের আবাসস্থান। মূর্ত্তিটি প্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু মুখ রৌপ্যের। ইনি চতুর্ভুজ, গলে হার বিলম্বিত, ইঁহার সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। পূজান্তে পূজারিগণ লোকদিগের কপালে তিলক দিয়া থাকেন। সম্মুখে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। কুকুর এই মন্দিরে আসিতে পায়, কিন্তু অন্য মন্দিরে যাইতে পারে না। পূজারিগণ মদ্যপায়ী। আসব দিয়া ভৈরবনাথের পূজা হইয়া থাকে। অদূরে পূর্ব্বদিকে নবগ্রহের মন্দির—সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি নবগ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহার পরেই দণ্ডপাণিনামক মন্দির বিরাজিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভৈরবনাথ এই স্থানে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক পাপীর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। এখানে "কালকূপ" নামে একটি কূপ আছে। লোকমাত্রেই এই কূপে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকে। যদি কেহ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়, তবে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু ধ্রুব। চেতগঞ্জ হইতে যে প্রধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তদুপরি অনেকগুলি উত্তম উত্তম অট্টালিকা বিরাজিত। সেগুলি দেখিবার বস্তু। রাস্তাটি কবির চওড়া নামক স্থানটী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বারাণসীর প্রসিদ্ধ তন্তুবায় এবং ধর্ম্মসংস্কারক কবিরের নামে কবির চওড়ার নামকরণ হইয়াছে। মিউনিসিপাল অফিসের পরেই প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হাঁসপাতাল এবং মহিলাগণের জন্য ঈশ্বরী মেমোরিয়াল হাঁসপাতাল অবস্থিত। অতঃপর মাধোদাসের উদ্যান। উদ্যানটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটি রাধাস্বামী পন্থীর আড্ডা। পূর্ব্বে চেত সিংহের বিদ্রোহকালে ইহা Warren Hastings এর আবাসস্থান ছিল। পরে নবাব ওয়াজীর আলি লক্ষ্ণৌ হইতে বিতাড়িত হইলে তাঁহাকে এই স্থানটি বাস করিবার জন্য দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে একটি উদ্যান ও আধুনিক অট্টালিকানিচয় দেখা যায়, তাহা ১৮৭৬ খৃঃ ভিজিয়ানগরের মহারাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুলিশ কোতোয়ালী, দক্ষিণে তারঘর, উত্তরে ময়দাগিন উদ্যান, নাগরী প্রচারিণী সভা এবং রাজা শিবপ্রসাদের বাড়ী এখানে বিরাজিত। এখান হইতে রাস্তাটি পূর্ব্ববাহিনী হইয়া

বিশ্বেশ্বর গঞ্জে গমন করিয়াছে। গঞ্জটিতে শস্যাদি, চিনি এবং শাক শব্জীর বাজার অবস্থিত। এই বাজার মিউনিসিপালিটি দ্বারা পরিচালিত। অতঃপর "মচ্ছোত্রি" পুষ্করিণীতে যাইয়া রাস্তাটি শেষ হইয়াছে। এখান হইতে আদমপুরামহল্লার প্রারম্ভ। প্রধান রাস্তাটির উত্তরাংশ পাকা, কিন্তু বহির্ভাগটি কাঁচা অট্টালিকায় পূর্ণ। স্থানটি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের জন্য। ইহার উত্তর দিকে কতকগুলি শাখা শড়ক প্রধাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি রাস্তা মাধো-দাসের উদ্যানবাটী হইতে, অওসানগঞ্জ এবং সাইতপুরা পুলিশ ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানটিতে লোহার বাজার অবস্থিত। হনুমান ফাটক নামে অপর একটি অপ্রশস্ত রাস্তা বিশ্বেশ্বরগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বেশ্বর গঞ্জের উত্তর দিকে হরতীর্থ নামে একটি পুরাতন ভগ্ন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ কালের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, সত্য যুগে এক বৃদ্ধ রাজা জরা-পীড়িত হইয়া বারাণসী ধামে আগমনপূর্ব্বক যোগে রত থাকেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে জরা হইতে মুক্ত করেন। রাজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃদ্ধ কালের আখ্যা দেন। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ হইতে যে রাস্তাটি এই স্থান পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে রত্নেশ্বরের মন্দির বিরাজমান। প্রবাদ এই যে, একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নগরের উন্নতি সাধন করিবার জন্য মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সঙ্কল্প করেন। মহাদেব রাত্রিতে তাঁহাকে স্বপ্ন দেন যে, তুমি এমন কুকর্ম্ম করিও না। পরদিন প্রত্যুষে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আসিয়া মন্দির ভগ্ন রদ করেন। অদূরে আলমগির মস্‌জিদ্‌ অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস এই যে, ইহা ১৬৫৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব দ্বারা নির্ম্মিত। প্রবাদ এই যে, বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির চূর্ণীকৃত করিয়া তাহার মসলা দ্বারা এই মসজিদটি গঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কিন্তু স্থানটি পবিত্র বলিয়া মানিয়া থাকে এবং মস্‌জিদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যেখানে ফোয়ারা অবস্থিত তথায় পূজাদি করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

পিতৃভক্তি।

(১)

প্রফুল্ল কুমার বসু এক ধনাঢ্যের একমাত্র সন্তান। বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। রূপে গুণে প্রফুল্ল একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন! অনেক স্থানে দেখা যায়, ধনবানের পুত্র ধনগর্ব্বে মাতোয়ারা হইয়া বাগ্‌দেবীকে গ্রাহ্য

করেন না। কমলার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধরাকে সরার ন্যায় দেখেন। কিন্তু আমাদের প্রফুল্ল সেরূপ নহেন। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

প্রফুল্ল প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এবং সারদার কৃপায় সেখানেও উত্তরোত্তর পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। প্রফুল্লের পিতা আনন্দ মোহন বসু হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আটর্ণী, তিনি মাসে মাসে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার আদি নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামে, তথায় পৈতৃক সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। পৈতৃক ভিটাতে ক্রিয়াকলাপাদি এখনও যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ং তথায় বড় একটা যান না, কলিকাতায় তাঁহার স্বকৃত সুবৃহৎ অট্টালিকাতেই সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। স্বদেশে বিষয় সম্পত্তি দেখিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত আছে, তাহারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রফুল্লর কিন্তু স্বদেশের উপর বড় টান, বড় অনুরাগ! তিনি অবকাশ পাইলেই গৌরিপুরে যান।

আনন্দ বাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী সুকুমারী এবং একমাত্র পুত্র প্রফুল্ল কুমার। এতদ্ভিন্ন বড়লোকের যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু অপরাপর স্থলে যেরূপ দেখা যায় যে, লোকে আশ্রিতের প্রতি কেমন একটা অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, এখানে সেরূপ হয় না! সুকুমারী প্রকৃত সুগৃহিণী, তাঁহার গৃহিণীপণার গুণে তাঁহার সংসারে সর্ব্বদাই শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রফুল্লও মাতার গুণ সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল শান্ত, মিষ্টভাষী, গর্ব্বরহিত, নম্র। যে একবার প্রফুল্লের মুখের একটী কথা শুনিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিত না। কি এক মোহিনী শক্তি যেন অলক্ষ্যে প্রফুল্লের হৃদয়ে বাস করিত।

এ সংসারের যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি একত্রীভূত করিয়া বিধাতা প্রফুল্লকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লের সেই হাসি হাসি মুখখানি প্রফুল্ল নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিত। প্রফুল্ল আত্মীয়, পর সকলের সঙ্গেই সরল ভাবে মিশিতেন। বালক বালিকাদিগের সঙ্গে প্রফুল্ল আজিও বালকের মত খেলা করেন। কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঠাকুরমার কাছে বসিয়া প্রত্যহ 'উপকথা' শুনিবার বাসনা তাঁহার আজিও প্রবল। জোৎস্না নিশিতে ত্রিতলের ছাদে, ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া, বালক বালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল উপকথা শুনিতেন। কোন কোন দিন উপকথা শুনিতে শুনিতে প্রফুল্ল ঠাকুরমার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন পৌত্র লাভ করিয়া বৃদ্ধা পিতামহীর

আর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি প্রত্যহ করযোড়ে ইষ্টদেবতার কাছে পৌত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেন। শুভ্র রজনী, শুভ্র জগৎ, আকাশে চন্দ্রমার শুভ্র হাসি, ক্রোড়দেশে কুসুমস্তবকবৎ গৌর-কান্তি-বিশিষ্ট প্রফুল্লকুমার! চাহিয়া চাহিয়া বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত।

প্রফুল্ল যে দিন গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, সে দিন প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গের পরে "আমরা সব গল্প শুনিয়াছি, তুমি শুনিতে পাও নাই" বলিয়া বালকবালিকারা প্রফুল্লকে লইয়া কত রহস্য করিত। প্রফুল্লও তাহাদের সহিত বালকের ন্যায় কলহ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেন।

বৃদ্ধার বড় সাধ প্রফুল্লের অনুরূপ রূপ-গুণান্বিতা একটী বালিকার সঙ্গে প্রফুল্লের বিবাহ দিয়া, পৌত্র ও পৌত্রবধূ লইয়া শেষ জীবনে পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু প্রফুল্লকুমার বিবাহ করিতে আদৌ সম্মত হইতেন না। বৃদ্ধা এক এক দিন আদরে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিতেন "হাঁরে, আমার রামের বামে সীতা এসে বোসবে কবে?" প্রফুল্ল অমনি হাসি-মুখে "কেন ঠাকুর মা! তুমিই ত আমার সীতা, এসনা, আমার বাঁদিকে বোসনা," এই বলিয়া নিজে পিতামহীর দক্ষিণে উপবেশন করিতেন! বালক-বালিকাগণ করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিত।

(২)

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধা বালক-বালিকা-পরিবেষ্টিতা হইয়া ত্রিতলের ছাদে বসিয়া তাঁহার দৈনিক কার্য্য হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন, আর শ্যাম গোয়ালা গাভী দোহন করিতেছে কি না মনে মনে তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। উপকথা বলিবার জন্য বালকবালিকারা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, এক এক জনে এক একটি গল্পের ফরমাইস করিতেছিল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্রফুল্লকুমার আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই বলিয়া বৃদ্ধা উপকথা বলিবার তত আগ্রহ করিতেছিলেন না। তিনি বালকবালিকাদিগকে স্তোকবাক্যে ভুলাইতেছিলেন এবং ঘন ঘন প্রফুল্লের আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহাস্যে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রফুল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার মাসতুতো ভাই এবং প্রিয় সুহৃৎ বিজয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রফুল্ল আসিয়া তাঁহার চির-অভ্যস্ত ইজারা মহল ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া ছাদের উপরে শুইয়া পড়িলেন, বিজয় ছাদের আলিসার উপরে বসিলেন। প্রফুল্ল হাসি হাসি মুখে বলিলেন "ঠাকুরমা একটা উপকথা বলনা গা, আজ একজন তোমার নূতন শ্রোতা এসেছে! প্রফুল্ল বিবাহে অসম্মত বলিয়া বৃদ্ধা সর্ব্বদা প্রফুল্লকে অনুযোগ করিতেন, আজিও তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন "আমি আর

তোকে উপকথা বলবো না, তুই আমার একটা কথা শুনিস্‌নে, আমি কেন তোর কথা শুন্‌বো? আমি রোজ রোজ তোকে উপকথা বোলতে পারব না।" এই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন "সে কি ঠাকুর মা! উপকথায় তোমার অরুচি হলো কবে? আমি তো জানি যে দিন উপকথায় তোমার অরুচি হবে, সে দিন আর তুমি বাঁচবে না। দেখি দেখি হাতটা, ধাত ছেড়ে যায় নি তো? গঙ্গায় নে যাব?

বৃদ্ধা। আমাকে গঙ্গায় দিতে পাল্লে বাঁচিস্! না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিলেন, "এক রকম! একটা ভাবনা কেটে যায় বৈ কি।

বৃদ্ধা। তোদের মাষ্টার বুঝি কেবল ফুকুড়ি শেখায়, গুরুজনের কথা শুন্‌তে শেখায় না?

প্র। মাষ্টার কি শেখায় না শেখায় সে কথা পরে বলবো, এখন তোমার কোন্ কথাটা শুনি নি তাই বল দেখি?

এই বলিয়া প্রফুল্ল অঙ্গুলি গণনা দ্বারা ঠাকুরমার কি কি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার তালিকা প্রদান করিলেন,—

"গলায় তুলসির মালার ফরমাইস ছিল, তা নবদ্বীপে বেড়াতে গিয়ে এনে দিয়েছি; রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা ঝুলির কথা বোলেছিলে, তা কাল কিনে এনেছি; আর ভাল নামাবলীর জন্য বৃন্দাবনে অর্ডার দিয়েছি; তবে তোমার কথা শুনিনি কবে ঠাকুর মা? বাকি কেবল গঙ্গায় নে' যাওয়া।

বৃদ্ধা প্রফুল্লের কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন, প্রফুল্লের চিবুক ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন "ভাই! একটি কথা যে কিছুতেই শুন্‌চিস্ না! বুড়ি কবে মরে যাবে, বুড়িকে গঙ্গায় না দিলে কি যে কর্‌বি না?"

শুনিয়া প্রফুল্ল আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ঠাকুরমা তুমি কি আমায় লেখা পড়া কত্তে দেবে না?"

বৃদ্ধা। বালাই! লেখা পড়া কত্তে দেব না কেন? কত লেখা পড়া করবে কর না ভাই, তোমার অভাব কিসের?

প্র। তবে এখন বিয়ে কত্তে বল কি করে? বিয়ে কল্লে কি আর লেখা পড়ার অবকাশ থাক্‌বে? মেম সাহেবের জুতা সাফ কত্তে কত্তেই আমার দিন কেটে যাবে যে।

বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হইলেন, প্রফুল্লের কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। বলিলেন "সে কিরে? জুতো কার সাফ্ কর্ব্বিরে? তুই কি মেম বিয়ে কর্ব্বি না কি রে?"

"এক রকম তাই বৈ কি?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অমন অলুক্ষণে কথা বলিস্ নি। মেম বিয়ে কর্ব্বি কিরে?"

বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া প্রফুল্লের রহস্যের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, গম্ভীর ভাবে তিনি বলিলেন, "কি করি? আমাদের

কলেজের সাহেব বড় ধরেচেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বে দেবেন, মাষ্টারের কথা অগ্রাহ্য করি কি করে? কাজেই আমাকে স্বীকার কত্তে হয়েচে।"

বৃদ্ধা মনে করিলেন, যথার্থই প্রফুল্ল কোন সাহেবের মেয়েকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেই জন্যই বিবাহে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'ও' তাইতে তুই বে কত্তে চাস্ না বটে? দাঁড়া তোর মাষ্টারের মেয়ে বে কর্‌া বার কচ্চি, আমি তোর সব কথা আনন্দকে বলে দেব। এই বলিয়া বৃদ্ধা এ কালের ছেলেদিগকে এবং তার সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাকে অজস্র গালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

গতিক নিতান্ত ভাল নয় দেখিয়া, বিজয় মীমাংসা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তথাপিও বৃদ্ধার মনের সন্দেহ একেবারে তিরোহিত হইল না।

৩

প্রফুল্লকুমার যে নিতান্ত বিনা কারণে বিবাহে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাহা নহে। শুধুই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বিবাহে অসম্মত হইতেন, সে কথা প্রকৃত নহে। কেন যে তিনি বিবাহ করিতে চাহিতেন না, তাহার কোনও নিগূঢ় কারণ ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি কলেজের অবকাশ পাইলেই গৌরীপুরে যাইতেন। সেই গৌরীপুরবাসিনী দরিদ্রা বালিকা রমা তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। রমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে প্রবৃত্ত হইল।

রামলোচন ঘোষ গৌরীপুরে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। প্রচুর ধন সম্পত্তি এবং তদতিরিক্ত দানশীলতাই তাঁহার যশ এবং সুনাম দিগদিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বনিয়াদী বংশ।

বিধাতা রামলোচন বাবুকে সমস্তই দিয়াছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার জন্য অনেক যাগযজ্ঞ করা হইয়াছিল, গৃহিণীও অনেক ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া গলায় অনেক মাদুলী ঝুলাইয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

এত সম্পত্তি ভোগ করিবে কে? এই ভাবিয়া তাঁহারা পতিপত্নী সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন, এবং রামলোচন বাবু তাঁহার প্রচুর অর্থ সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল। পত্নীবিয়োগের পরে তিনি সংসারে আরও বীতস্পৃহ হইলেন, এবং দান ধ্যান লইয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অর্থ দ্বারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেন, কাহারও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনিই শ্রাদ্ধের সকল ভার গ্রহণ করিতেন, দরিদ্র ছাত্রগণের পাঠের ব্যয় বহন করিতেন, ফলতঃ তিনি দরিদ্রের পিতামাতা স্বরূপ

ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যেখানে চতুষ্পাঠী, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ হইত, তিনিই সে সকলের ভার গ্রহণ করিতেন। যত অর্থের আবশ্যক হইত, তিনিই তাহার অধিকাংশ প্রদান করিতেন। যশোহর জেলার মধ্যে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে বিধির বিধানে তিনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই কন্যাই আমাদের রমা। রমা যখন তিন বৎসরের মাত্র, সেই সময়ে রামলোচন বাবু হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নী শিশু কন্যা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রামলোচন বাবু যেরূপ দানশীল ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নী ও কন্যার জন্য নগদ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ বন্ধক দিয়াছিলেন। সুদে আসলে ঋণ বর্দ্ধিত হইলে উত্তমর্ণ সেই বন্ধকী বিষয় নিলামে ডাকিয়া লইল। বাকি যাহা ছিল তাহা পাঁচজনে সড় করিয়া যে যেরূপে পারিল আত্মসাৎ করিল। এমনি কালের গতি, রামলোচন বাবু যাহাদিগকে বড় বিশ্বাসী ভাবিতেন, যত্নের সহিত যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, তাহারাই সময় পাইয়া তাঁহার স্ত্রী-কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কেহ ধর্ম্মের দিকে চাহিল না, প্রভাতের তারকার ন্যায় সকলে একে একে প্রস্থান করিল। বিধবা যুবতী একাকী সংসারের আবর্ত্তে পতিত হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। "আহা" বলিয়া একবার সমবেদনা জানাইবারও তাঁহার কেহ ছিল না। কিন্তু তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই শিশু কন্যাটি লইয়া একাকিনী সেই বৃহৎ পুরীমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বঞ্চকের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। তিনি ধীরচিত্তে ভগবানের দিকে চাহিয়া কন্যাটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় বালিকা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রূপে গুণে সেই ক্ষুদ্র বালিকা রমা অতুলনীয়া হইয়া উঠিল। আনন্দ বাবুর বাটীর সন্নিকটেই রামলোচন বাবুর বাটী, প্রফুল্ল বাটী আসিলেই রমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত। বালিকার অসাধারণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত সরলতা দেখিয়া প্রফুল্লকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রমার মাতা প্রফুল্লকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, আর রমার মাতার সেই অকৃত্রিম স্নেহে প্রফুল্লকুমারও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। ক্রমে প্রফুল্ল রমার সেই অতুল রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইলেন, বাল্যের সেই ভালবাসা ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল।

রমা কুলে, শীলে উচ্চ, সম্ভ্রান্ত বংশের

কন্যা। প্রফুল্ল অপেক্ষা জাত্যংশে কিছু-মাত্র ন্যূন নহে। প্রফুল্লের সহিত বিবাহে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। প্রফুল্ল ধনবান্ পিতার একমাত্র সন্তান! পিতা মাতা প্রফুল্লের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করেন না। সুতরাং প্রফুল্ল ভাবিলেন, তিনি রমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই পিতা মাতা অবশ্যই এ বিবাহে সম্মত হইবেন।

হায়! ভ্রান্ত বিষয়ানভিজ্ঞ যুবক! বিষয়ী ব্যক্তির অন্তরমধ্যে প্রবেশ লাভ করা তোমার সাধ্য কি?

রমার রূপ গুণ থাকিলে কি হইবে? রমা বনীয়াদি বংশের কন্যা হইলে কি হইবে? এ সংসারে মানুষের যাহা স্পৃহণীয়, রমার তাহা কই? রমার অর্থ কই? বিধির বিধানে সে যে আজ দরিদ্র বিধবার কন্যা। অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুমি প্রফুল্লকুমার। রমার সঙ্গে বিবাহ কি তোমার সম্ভবে?

প্রফুল্ল লজ্জা বশতঃ স্বীয় পিতামাতাকে মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রমার মাতাকে বলিলেন। রমার মাতা বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝিলেন এ বিবাহে প্রফুল্লের পিতা কিছুতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু প্রফুল্ল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তিনি পিতার নিকটে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলে অবশ্যই তিনি সম্মত হইবেন, কখনই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না, তাঁহার পিতা সে প্রকার লোক নহেন।

৪

যথাসময়ে প্রফুল্লকুমার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্. বি, উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে বৃদ্ধা পিতামহী স্বীয় পুত্রকে প্রফুল্লকুমারের বিবাহের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুযোগ করিতে লাগিলেন, আনন্দ বাবুও এইবার পুত্রের বিবাহ দিতে স্থির সংকল্প করিলেন।

আজি কালিকার দিনে কি আর প্রফুল্লের মত পাত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে হয়? সমাজ যদি দশটা মেয়ে প্রফুল্লের কণ্ঠে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইত, তবে তাহাও দিত। বহু ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে প্রফুল্লের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কন্যার সহিত প্রফুল্লের বিবাহ দিবার নিমিত্ত আনন্দ বাবুর নিকটে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবুও তন্মধ্য হইতে পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল দেখিলেন বিপদ! আর তো তাঁহার "বিবাহ করিব না" বলিয়া কোনও ওজর আপত্তি চলিবে না। কিন্তু তাঁহার চিত্ত যে রমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রমা ভিন্ন অন্য কাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিবেন না। যদি রমাকে না পান, তবে চিরকুমার হইয়া থাকিবেন, তথাপি অন্য মহিলার পাণিগ্রহণ করিবেন না।

হায়! বাঙালীর আশা, বাঙালীর পণ কি সকলি জলের রেখাবৎ মুছিয়া যায়!

প্রফুল্ল পিতামাতার কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলেন না। লজ্জা আসিয়া বাধা প্রদান করিতে লাগিল।

সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি বিজয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বিজয় ধীর ও বুদ্ধিমান্, তিনি সব শুনিয়া বড় বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন "ভাই! এ আশা পরিত্যাগ কর। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই। তোমার পিতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে, এবং এ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন মত প্রকাশ করাও গর্হিত, তাহা সুসন্তানের কার্য্য নহে। আর ভাই এ বিবাহে তোমার পিতা যে সম্মত হইবেন, তাহাও আমার বোধ হয় না। কেননা, রমা রূপে গুণে অতুলনীয়া হইলে কি হইবে? রমা দরিদ্রের কন্যা, বংশমর্য্যাদা থাকিলে কি হয়, সে দরিদ্র বিধবার কন্যা, এরূপ দরিদ্র বিধবার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে তোমার পিতা কখনই ইচ্ছুক হইবেন না। অতএব ভাই! তুমি এ আশা পরিত্যাগ কর।"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভাই সংসারে অর্থই কি এত শ্রেষ্ঠ, এত স্পৃহনীয়? পিতামাতা কি আপনাদের সন্তানের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? আমার পিতার অর্থের তো কোনও অভাব নাই। আর আমি ভিন্ন তাঁর অন্য সন্তানও নাই, তথাপি কি তিনি অর্থ বিনিময়ে আমাকে অপরের নিকটে বিক্রয় করিবেন। আমি যদি রমাকে না পাই, তবে, নিশ্চয় জানিও এ জীবনের মত আমার সুখ, শান্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।"

বিজয় অবসর মত আনন্দ বাবুকে সমস্ত কথা বলিলেন, এবং যাহাতে রমার সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধও করিলেন। আনন্দ বাবু মনোযোগ সহকারে বিজয়ের কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না।

প্রফুল্ল পরীক্ষার পরই গৌরীপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, বিজয়ের কাছে সকল কথা শুনিলে পিতা অবশ্যই সম্মত হইবেন। প্রফুল্ল হৃষ্টচিত্তে গৌরীপুরে বাস করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন রমার মুখকমল দর্শন করিয়া রমালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

রমার মাতার অকপট স্নেহে প্রফুল্ল বড়ই সুখী হইতেন। রমার মাতা তাঁহার বাগানের শশা, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলমূল ছাড়াইয়া প্রফুল্লকে খাইতে দিতেন, প্রফুল্ল তাহা উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন। রমা তাহার সুকোমল হাতে পান সাজিয়া আনিয়া দিত, প্রফুল্ল তাহা অতি দুর্লভ জ্ঞানে চর্ব্বণ করিতেন। সে দরিদ্র বিধবার ঘরে বিষয়ের আবিলতা নাই, শান্তি ও

সরলতা তথায় সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আর সেই সারল্যপ্রতিমা রমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রফুল্ল আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। আর প্রফুল্ল ভাবিতেন এক দিন এই স্বর্ণ-প্রতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন সফল করিবেন।

আশার আনন্দে প্রফুল্ল দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ ডাকযোগে তিনি দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, একখানি পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, অপরখানি বিজয়ের। পত্র দুইখানি দেখিয়া প্রফুল্লের মন কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হস্তে পত্র দুইখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রথমে পিতার পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু—

বাবা প্রফুল্ল! পত্র পাঠ মাত্র তুমি এখানে চলিয়া আসিবে। ২৩শে আষাঢ় তোমার শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তুমি ওখানে আর বিলম্ব করিবে না। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। অত্র শুভ।

ইতি নিত্যাশীর্ব্বাদক
আনন্দ।

পত্রখানি বড় তাড়াতাড়িতে লেখা, প্রফুল্ল পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, কোথায় বিবাহ? কাহার সহিত? রমার সঙ্গে কি? ভয়ে ভয়ে প্রফুল্ল বিজয়ের পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিজয় লিখিয়াছেন—"ভাই, প্রফুল্ল! তুমি যে কার্য্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলে আমি যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার পিতার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।" ব্যারিষ্টার এ, পি, ঘোষের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। ভাই, তুমি যদি এ বিবাহে অসম্মত হও, তবে তাঁহার মনস্তাপ এবং অপমানের একশেষ হইবে। তুমি হিন্দুসন্তান, আশা করি পিতার অবাধ্য হইবে না। স্মরণ রাখিও হিন্দু শাস্ত্রে আছে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥" ইতি।

অভিন্নহৃদয়—বিজয়।

পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রফুল্লের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইল তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? তিনি যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিকে নিজের সুখশান্তি, অপর দিকে পিতৃভক্তি, একদিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন, অন্য দিকে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন স্বরূপ মহাপাতক। তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অচেতনবৎ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

হায়! জন্মের মত তাঁহার আশা ভরসা কি বিসর্জ্জন দিতে হইবে? তাঁহার হৃদয় হইতে সেই অপূর্ব্ব-প্রেম-প্রতিমা রমার প্রতিমূর্ত্তি কি মুছিয়া ফেলিতে হইবে?

রমার মাতার নিকটে তিনি যে স্পর্দ্ধা সহকারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রমাকে বিবাহ করিবেন, এবং তাঁহাকে যে রমার অন্য সম্বন্ধ এ পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই। এখন তিনি তাঁহাকে কি বলিবেন?

হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, এখন কিরূপে তাহা মুছিয়া ফেলিবেন?

চিন্তায় প্রফুল্লকুমারের হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। এক এক বার তাঁহার পিতার উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন তিনি পিতার প্রস্তাবিত পাত্রীকে বিবাহ করিবেন না, যেরূপে হউক রমাকেই বিবাহ করিবেন। আবার পরক্ষণেই বিজয়ের পঠোক্ত শ্লোকটী স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া লইলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ এবং পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কে বলে,—ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পায়? কে বলে,—ইংরাজী শিক্ষায় হৃদয়ে পাশ্চাত্য ভাব আনয়ন করে? হিন্দু চিরদিনই হিন্দু থাকিবে। যত দিন হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুর হৃদয়ে ধর্ম্মজ্ঞানও জাগরিত থাকিবে। তবে দৈবাৎ যদি কোথাও দুই একটা কুলাঙ্গার ইহার ব্যতিক্রম করে, তাহার জন্য সমগ্র হিন্দু-জাতি দায়ী নহে।

প্রাতে প্রফুল্লকুমার যখন শয্যাত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত স্থির অবিচলিত! কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে তাঁহার চেহারা এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহার বদন বিশুষ্ক, কেশ রুক্ষ, মুখের সে হাসি হাসি প্রফুল্ল ভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রমার মাতার ভবনে গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রমার মাতা তখন রমার কেশবিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন, রমার সুন্দর রেসম-বিনিন্দিত কেশরাশি লইয়া বেণী বিনাইতেছিলেন। এমন সময়ে প্রফুল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র প্রফুল্ল অনিমেষ নয়নে সে দৃশ্য দেখিয়া লইলেন।

রমার মাতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

নারীর কর্ত্তব্য।

আজ কাল আমাদের সমাজে একটা কথা উঠিয়াছে যে, পুত্রের বিবাহে পিতার যদিও বিনা পণে বিবাহ দেওয়া অভিমত হয় ত গৃহিণীগণ মিহিস্বরে বলেন "আমার রাঙা বৌ এবং চুড়ী খুটের গহনা চাই, নতুবা পুত্রের বিবাহ দিব না। আর তারা যেন ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে পারে, নতুবা প্রতিবেশিনীগণ বলিবে 'হাঘরে ঘরের মেয়ে ঘরে এনেছে।' সব দিক দেখিয়া কার্য্য করিও, নহিলে আমি গলায় দড়ি দিব।"

হায়! কি দুঃখের বিষয়। সমগ্র নারীর গর্ব্ব ও মর্য্যাদা এই নীচতায় ডুবিয়া যায় না কি? সুতরাং যাহাতে এই সকল কথা না উঠিতে পারে, নারীমাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সকল সন্তানবতীই যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাসা—কুৎসিত ও দরিদ্র কুমারীগণ কি চিরকুমারী থাকিবে?

শুভ বিবাহে আজ কাল কন্যার বাটীতে প্রায়ই গভীর নিরানন্দের ছায়াপাত হইয়া থাকে। এমন কি আত্মহত্যাও দৃষ্ট হয়, তথাপি আমাদের চৈতনা হয় নাই। পুত্রকন্যাগণ যখন একই ঈশ্বর-প্রেরিত ও এক মাতৃগর্ভে উৎপন্ন, তখন কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় কেন? উভয়ের স্বতন্ত্র মূল্য কেন? একবার আমার এক আত্মীয়ার একটি কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া দেখিতে যাই, এবং গিয়া প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করি "কেমন মেয়ে হ'ল তোমার, বকুল?" তিনি সঙ্কুচিত ভাবে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "মেয়ে আর কেমন হবে ভাই! ওরা সুন্দর হ'লেও কুৎসিত। যে মুহূর্ত্তে খুকী ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে, আর বাটীর লোকেরও মুখ আঁধার হয়ে গেছে।" প্রসূতির সেই করুণ স্বর আজিও আমার কর্ণে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। তাহার পর সেই কচি মেয়েটিকে দেখিলাম যেন একটি গোলাপের কুঁড়ির মত জননীর কোল আলো করিয়া শয়ন করিয়া আছে। তাহাকে স্বর্গের একটা স্থানভ্রষ্ট আলোকোজ্জ্বল রশ্মির অন্যতমা বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম মেয়েটি কি সুন্দর! তখনি তাহার জননীর কাতর মুখ পানে চাহিলাম। ভাবিলাম, গৃহস্থের অমঙ্গল-কারিণী মেয়ে! তুই এখনি মর।

কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আজ কাল হিন্দু সমাজ বড়ই অমঙ্গল বলিয়া গণ্য করি-তেছে। তাহার কারণ সমাজের লোকেরা নিজেরাই নহেন কি? সকলেই যদি নিজ নিজ পুত্র কন্যা বিনা পণে পরস্পর বিনি-ময় করিয়া লয়েন, তাহা হইলে কেহই আর কন্যাগণকে অমঙ্গলকারিণী বলিয়া

মনে করিবেন না। পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু শুধু অর্থেই বিধাতার রাজ্য চলে না। প্রত্যেক নারীই যদি এককালে পুত্রের জননী হইবার আশা করেন, তবে সংসার, সৃষ্টি, লয়, উৎপত্তি এককালে সবই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। বংশরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই দুই একটী পুত্রের আবশ্যক বটে, কিন্তু আমরা ছয় সাতটী পুত্রের জনক জননীকেও একটী কন্যার ভার গ্রহণ করিতে কাতর দেখিয়াছি।

সমাজে উত্তরোত্তর কন্যার অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি বয়ঃস্থা অনূঢ়া কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া পিতা মাতা তাহার মৃত্যু কামনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সকলের মূলেই এই বিবাহের পণ-প্রথা। বিবাহে অর্থ ব্যয় হয় বলিয়াই কন্যা আমাদের সমাজে এত উপেক্ষণীয়া। সুতরাং যাহাতে আমাদের জাতির এই অনাদর সমাজ হইতে উঠিয়া যায় সকল নারীরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজ যাঁহার বিবাহের জন্য পিতা মাতা ভাবিয়া সারা হইতেছেন, হয়ত বাস্তু ভিটা বিক্রয় ও তৈজস বাঁধা দিয়া যেন তেন প্রকারে এক বিপত্নীক আশী বছরের কুটীরবাসী বৃদ্ধের সহিত মাল্য বিনিময় করাইয়া দিলেন, কাল পুত্রবতী হইয়া তিনি হাঁকিলেন "৫০০০৲ হাজার মুদ্রা, হীরার আংটী, বৌয়ের জড়োয়া সুটের গহনা চাই। আর তার বাপ বার মাসে তেরটা তত্ত্ব কর্ত্তে পারে এমন মেয়ের সঙ্গে আমার সোণার ছেলের বিয়ে দেব। আমার বাছার মতন ছেলে পাবে কোথায়? ছবার পাশ দিতে ফেল হয়েছে, এমন ছেলে কি পাওয়া যায়? যাদের ভাগ্যে থাক্‌বে এমন ছেলেকে জামাই করবে।" সেই সময় তাঁর একবার নিজের বিবাহের কথা স্মরণ হয় না কি? সেই সময় তাঁর সেই চিন্তা-ভার-গ্রস্ত পিতার রোদন ও জননীর কাতর মুখ মনে পড়ে না কি?

আর বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি "ওরা মেয়ে মানুষ ওদের বুদ্ধি কি? ওদের কথা শুনে কাজ করলেই সব পণ্ড হবে।" তবে জিজ্ঞাসা, তাঁরা যখন মেয়েদের সব কথাই অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন, বিবাহের কথাটার বেলায়ই বা শুনেন কেন? যেখানে সেখানে গম্ভীর ভাবে বলেন কেন যে "গিন্নি বলেছেন 'বৌমাটি যেন একটু সুন্দর হয়, এমন গহনা পত্র দেবে যেন রায় বাহাদুরের বড় বৌ এসে তার গহনার বড়াই না করতে পারে, আর ছোট মেয়ে নলিনীর বিয়ের খরচটাও যেন বেহাই দেন। তাঁর জামাইয়ের পড়বার ভার ত তিনি নেবেনই। তত্ত্বটা যেন পাঁচজনকে দিয়ে খেতে পারি, এমন বেহাই কর।' তা আমার মত ছিল আপনার ছোট মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে যাই, কিন্তু কি করব গিন্নির আজ্ঞার।" অম্লানবদনে সে সকল কথা বলিতে যে পুরুষ লজ্জা না পান, তাঁহাকে শত ধিক্কার। ইহাঁরাই না "সমাজ! সমাজ!" করিয়া চীৎকার

করেন। হায়! "সমাজের উপকারের জন্য পুত্রের বিবাহের পণ লওয়া গর্হিত কার্য্য। আমাদের হরনাথ বাবু বড় সৎ ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উপর্য্যুপরি চারিটি পুত্রের বিবাহে একটি পয়সাও লয়েন নাই।" বলিয়া ইঁহারাই না উপন্যাস লেখেন? ইঁহারাই না সভাসমিতিতে উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়া "বরদান লওয়ার মত পাপ আর নাই, সুতরাং আমাদের সমাজে বরপণ যাহাতে উঠিয়া যায় সকলের একমত হয়ে তাহাই করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিয়া কানে তালা ধরাইয়া দেন? আর দর্শকমণ্ডলী কর-তালির সঙ্গে "সাধু সাধু" শব্দ শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন ও ইলেকট্রিক ফ্যানের বায়ু সেবন ও বোতল বোতল লেমনেড ও বরফের শ্রাদ্ধ করেন। তার পর বাড়ী গিয়া নিজ ধনুর্দ্ধর অকাল কুষ্মাণ্ড বখাট ছেলের বিবাহের জন্য গিন্নির মতানুসারে বিশ হাজার টাকা পণ চাহিয়া বসেন। ধিক্ শত ধিক্!

ইঁহারাই আবার সমাজপতি! যাহাদের সমাজের নেতা এ প্রকার, তাহাদের সমাজ উচ্ছন্ন যাইবার আর বিলম্ব নাই।

উপন্যাস লেখা ও বক্তৃতা করা যদি অর্থসাপেক্ষ হইত, তবে তাহাও নিশ্চয় দুর্ল্ভ হইত।

মুখে যেরূপ কথা, কাজে সেইরূপ করিবার লোক বুঝি আজ কাল আমাদের সমাজে নাই। হিন্দু সমাজ তাই শ্রীহীন হইয়াছে। সে শ্রী ফিরাইয়া আনিবার মত লোক সমাজে নাই। অথচ বক্তৃতা-গৃহে অর্থহীন ফাঁকা কথায় সেই পূর্ব্ব শ্রী ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস। তাহার অপেক্ষা সেই সময় নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া চিত্ত সংযত করিবার আভ্যাস করিলে ফল দর্শে, এবং সমাজেরও উপকার হয়।

যা হ'ক সমাজপতিদের কথা তাঁহারা নিজেরা বলিবেন। অনধিকার চর্চ্চায় আমার প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

ভগ্নিগণ! যাহাতে সমাজ আমাদের জাতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে না পারে এমন কার্য্য করা, যাহাতে সমাজ আমাদের জাতি জন্মিবামাত্র অমঙ্গল বলিয়া মনে না করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

সকলে মিলিয়া আমরা যদি সমাজ হইতে বরপণ প্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হই, তাহা হইলে অবশ্যই এ প্রথা সমাজ থেকে দূর হইবে। একদিন আবার সেই শুভ বিবাহ ফিরিয়া আসিবে, এ অশুভ বিবাহ দূর হইবে। রাঙা বৌ, ভয় ও অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া স্বামী পুত্রকে উদ্দীপিত করিয়া যাহাতে এ পাপ প্রথা ত্যাগ করাইতে পারি, আসুন তাহার চেষ্টা করি। নারীর কার্য্য নারী না করিলে, নারীর মান নারী না রাখিলে, আর কে রাখিবে? স্বামী পুত্র? সেদিন অনেক দিন আগে চলিয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রৈণতার ভান দেখাইয়া স্বামিগণ অবলীলাক্রমে স্ত্রীর অযশ সমাজের

সম্মুখে গাহিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না। পুত্র হাসি-মুখে জননীকে অবজ্ঞা করিয়া নিজ অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন। স্বামী মনে করেন স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমি সমাজের দশজনের সম্মুখে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি, আর স্ত্রীকেও সম্মান দেখাইয়াছি। অমন সম্মান যে স্ত্রী অবলীলাক্রমে মাথায় তুলিয়া লয়েন, তিনি নারী-নামের অযোগ্য। অমন সম্মান আমরা চাহি না, যাহাতে সমাজ আমাদের কোন রূপ নিন্দা না করিতে পারে, যাহাতে অশুভ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে গিন্নির রাঙা বৌয়ের সাধও সমাজের চক্ষু হইতে বিলুপ্ত হয়, বিধিমতে গৃহিণী-গণের সে চেষ্টা করা উচিত।

আমরা দরিদ্রকন্যাবধূকে যৎপরো-নাস্তি পীড়ন করিতে ছাড়ি না। কারণ তাহার পিতা আমাদের তত্ত্ব করেন না। আমাদের হতশ্রদ্ধায় কত বধূ অকালে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! কি দুর্দৈব? হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যায় না কেন? বধূর শ্বশ্রূমাতা-গণও ত এককালে বধূ ছিলেন। আবার শুনেছি সেকালে বধূদের শাস্তি বড় কঠিন ছিল। কালে শাশুড়ীর পদ পাইয়া কোন্ প্রাণে তাঁহারা আবার বধূকে অনাদর করেন। আমরা স্বচক্ষে বধূর প্রতি বধূর মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতা কর্ত্তৃক এত লাঞ্ছনা হইতে দেখিয়াছি, যে তাহা শুনিলে কেহ কেহ হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। হিন্দু সমাজের বধূগণ কবে শাশুড়ীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইবে?

হায়! জননী স্নেহলতা! হায় কুমারী সরলা! তোমরা বিবাহ-যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়া ভাবিয়াছিলে সমাজের এ অমঙ্গল মেঘ অপসৃত হইবে? বঙ্গ-গগনকে যে পণ-প্রথা রূপ পুঞ্জীকৃত কৃষ্ণ মেঘরাশি ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে মেঘ হইতে মুক্ত হইবার আশা আর আছে কি না? তোমাদের মরণে বঙ্গ সমাজের চক্ষু ক্ষণকালের জন্য উন্মেষিত হইয়াছিল। আবার পলকের মধ্যে সে জ্ঞান-চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এ কালঘুম আর ভাঙ্গিবে না।

যে সমাজ, যে পিতামাতা, এ সব কুমারী কন্যা বলি দিয়াও পণপ্রথা বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহারা যে কোনও কালে পরার্থের প্রতি লোভ ও রূপের মোহ ত্যাগ করিতে পারিবে তাহাত বোধ হয় না।

কুৎসিতাদের কি হৃদয় নাই? তাহারা কি সাধারণ মানুষের মত নহে? শরীরের উপরকার চামড়াটা কটা হইলেই কি একাধারে সব পাওয়া যায়? সেই বধূর গর্ভে কুৎসিত সন্তান সন্ততি জন্মিলে বিবাহ দিবার মুস্কিল বটে, কিন্তু ঐ পণ-প্রথা দূর হইলেই সমাজ সুন্দর কালোয় বিনিময় করিয়া লইতে পারেন। আমরা সুন্দরী বধূকেও কালো কন্যার জননী হইতে দেখিতেছি। অনেক ইউরোপীয় ত "কালা বাঙ্গালীর" নামে

নাসিকা কুঞ্চিত করেনই, তাহার উপর সেই কালা বাঙ্গালী যদি সামান্য কটা চামড়া বিশিষ্ট, অর্থাৎ সুন্দর হইয়া এরূপ করেন, তাহ'লে আর রক্ষা নাই। তাহ'লে বিধাতার নিকট 'আমরা কালো মেয়ে ভাল বাসি না' বলিয়া আবেদন জানাইতে হয়। আমাদের হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ ও মহাশক্তি, মুক্তিদায়িনী, মাতৃকা মূর্ত্তির বর্ণ ত ঘোর মসিবরণ। তাহা হইলে তাঁহাদের সৃজিত জগতে আমাদের অবস্থান করা উচিত নহে, আর তাঁহাদের দত্ত অবস্থাতেই বা আমরা সুখ দুঃখানুভব করি কেন? পুরাকালের মূর্খ সাধকগণ কি গুণে যে ঐ দুই কালোমূর্ত্তির ভিতর জগৎ-আলো-করা রূপের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

কালোরূপের পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছি বলিয়া আমায় যেন কেহ কালো না মনে করেন, আমার বর্ণ সকলে বলেন ঠিক যেন কাঁচা সোণা। সত্যের অনুরোধে আমি নিজেকেও দুকথা বলিতেও পরাঙ্মুখ নহি!

যাক ও বিষয় বলিবার মতন উপস্থিত আর কিছুই পাইলাম না, সুতরাং এইবার বিদায় লইব। ভগ্নিগণ, যদি নিজেরা আপন আপন সম্মান রাখিতে সচেষ্ট হয়েন, তবে পতি পুত্রকে রূপের মোহ ও অর্থের লালসা বহ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে আমাদের সমাজে নারী আবার লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইবেন। কন্যা সন্তান আবার সকলের আদরণীয় হইবে, সংসারে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ভগ্নিগণের মধ্যে একজনও যদি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়া সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমার এই সাময়িক মনোচ্ছ্বাসের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া, ইহার এক কণাও সদ্ব্যবহার করেন, তবে শ্রম সফল জ্ঞানে কৃতার্থ হইব।

নিবেদিকা—

শ্রীমতী প্রমীলাবালা মিত্র,

গয়া, ২০-৫-১৫

নূতন সংবাদ।

সংস্কৃত পরীক্ষায় মুসলমান রমণীর উপাধি লাভ।

নদীয়া জেলানিবাসী সেখ জমীরুদ্দিন সেখের কন্যা বিবি নুরজাহান সংস্কৃত পরীক্ষায় আর্য্য সমাজ হইতে সরস্বতী উপাধি পাইয়াছেন। ইহাঁর পিতা সেখ জমীরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ উপাধিধারী।

রমণীর গৌরব।

সুপ্রসিদ্ধ রায় রামজী মালবারীর কন্যা

কুমারী ফিরোজা সম্প্রতি বিলাতের রয়াল লণ্ডন অপথ্যালমিক হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জীবাণুতত্ত্ববিদের কার্য্যে সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

অতীতের সনে যা কিছু মলিন
করিয়া সুদূরে দূর,
এ নব প্রভাতে দাও মা! বীণায়
নবীন রাগিণী সুর।
নবীন ছন্দে নব অনুরাগে
নবীন ভরসা বুকে,
নবীন উদ্যমে নব শকতিতে
বাজাই যেন মা সুখে।
জীবনে মরণে বিপদে বিষাদে
জাগায়ে মরমে প্রীতি,
তোমারি রাগিণী বাজাও বীণায়
নব নব রূপে নিতি।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত,
চট্টগ্রাম।

মৌন

তব—স্তব্ধ-শান্ত-স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি কাছে,
নাহিক বিবাদ-দ্বন্দ,
তর্ক বিতর্কের কুটিল কলাপ,
প্রখর মুখর মন্দ।
নাহি—দুঃখ, করুণার তীব্র হাহাকার,
নিখিল-অখিল ধন্দ,
প্রণয় বিভোল উচ্চ হাসি রোল,
উতল মাতল বন্ধ।
তুমি—ক্রোধে মহা ধৈর্য্য, অভিমানে শান্তি
প্রেমের সরম স্পন্দ,
করিব জল্পনা, কাব্যের কল্পনা,
মধুর মোহন ছন্দ।
যত—যোগী, মুনি, ঋষি, জীবন সাধনে,
পিয়ি তব মকরন্দ,
ভুলি পরমাদ বাদ-বিসম্বাদ,
লভেছিল ব্রহ্মানন্দ।
তবে—এস সৌম্য তুমি! হৃদয়ে আমার
হও হে জীবনবন্দ্য,
তোমার পরশে দূর হ'ক যত,
কল্লোল-কোলাহল-দ্বন্দ।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

"অর্ঘ্য।"

বনের মাঝারে নিভৃত আঁধারে
কুসুমটি ছিল ফুটিয়া,
প্রভাত শীতল অনিল চঞ্চল
যেত পরিমল লুটিয়া,
বৃক্ষতলায় দেখিনু সেদিন
পড়ে আছে ফুল গন্ধবিহীন,
এনেছি ছিন্ন পুষ্প অর্ঘ
অঞ্জলি মোর পূরিয়া,
চরণে তোমার পুনঃ অভ'গার
উঠুক সে ফুল ফুটিয়া।

আশীষ।

এস আজ এস, নবীনা কুমারী,
এনেছি বরিতে শঙ্খ-ধ্বনি করি,—
আনন্দ, আশীষ, শুভ ইচ্ছা হ'য়ে
স্বর্গ হ'তে তুমি এসেছ নামিয়ে।
নৃপেন্দ্র-প্রাসাদে জিতেন্দ্র-দুহিতা,
বরদা-দুহিতা তোমার সুমাতা,
এ জগতে তুমি হবে পরিচিত,
মনোনীত নামে হ'য়ে অভিহিত।
শুভ দিনে এই শুভক্ষণে আজ
বাজিছে বাজনা প্রাসাদের মাঝ,
তব পিতামহী মহারাণী সতী,
তোমা ধনে লয়ে হৃষ্টমন অতি,—
সঙ্গে লয়ে সব আত্মীয় স্বজন,
পূজিছেন আজি শ্রীহরিচরণ।
আকুল হৃদয়ে উঠিছে প্রার্থনা,
বিভুপদে করি কল্যাণ কামনা।
ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, নৃপতি নৃপেন্দ্র,
প্রিয় দরশন সে রাজরাজেন্দ্র,
তুমি যে তাঁদের বড় আদরের,
শুভাশীষ যাচি আজি তাঁহাদের।
স্বর্গবাসী তাঁরা বিধাতৃ-বিধানে,
কেমনে দেখিব তাঁদের এখানে,
তাঁরা না আসিলে এ শুভ উৎসবে,
প্রাণের অভাব কেমনে পূরিবে?
ভক্ত-মাতা তুমি কল্যাণ-দায়িনী,
ভক্তগণ ল'য়ে এস মা জননী,
স্বর্গ, মর্ত্ত আজ এক হ'য়ে যাক,
সে শোভা দেখিয়া হৃদয় জুড়াক।
দীর্ঘজীবী হ'য়ে পিতৃ-মাতৃ-কোলে,
জীবন-সৌরভে তুষিও সকলে।
তব তরে আজ চরণে তাঁহার,
দিই পুষ্পাঞ্জলি, এ দান যাঁহার।

সুমতি মজুমদার।

প্রহ্লাদের প্রতি।

দনুজকুলের মণি কহগো প্রহ্লাদ গুনি,
এ অমূল্য নাম তুমি কোথায় পাইলে।
যার বলে বিষপানে প্রাণ দান পেলে॥
পিতা তব হরিদ্বেষী, তুমি হ'লে অবিনাশী,
পিয়ে যেই সুধারাশি দাও মোরে কয়ে।
অমর অমৃত সেই নাম মধুময়ে॥
ঘাতকের তীক্ষ্ণ অসি, ভয় যাহে অঙ্গে পশি,
নিষ্পেষিত নাহি করি নিজ পদতলে,
সাদরে বারণ পৃষ্ঠে লইল যে বলে॥
বক্ষমাঝে গিরি ধরি, স্থির অবিচল হেরি,
ওপদে মিনতি করি হইয়া সদয়।
সে অমৃত নামে দাও ভরিয়া হৃদয়॥
ভীষণ জলধিজলে, সন্তরণ করি কূলে,
আইলে যাঁহার বলে দাও তাঁর পরিচয়।
কি নাম তাঁহার হয়, কোথা বা আলয়॥
শুনি সেই নাম গান, পুলকে ভরিবে প্রাণ,
মহার্ণবে হই পার সেই নাম ধরে।
জীবনের পরপার মহাসিন্ধুতীরে॥

হরধনুর্ভঙ্গকালে।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ সম কঠোর বিষম
পিনাকীর হেন সুকঠিন ধনু।
কেমনে সখিরে এ কোমল করে
করিবেন ভঙ্গ দুর্ব্বাদল তনু॥
সুকোমল অতি রঘুকুলপতি
হেরি আতঙ্কেতে কাঁপিতেছে প্রাণ।
হায় পিতঃ তব অতি অসম্ভব
না জানি কেন এ দারুণ পণ॥

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 622. June, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২২ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। জুন, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরলা।

(১)

আর তো অধিক দিন বাঁচিব না, আমার অসার জীবন-কাহিনী কিছু লিখিয়া রাখি। তোমাদের সহিত আমার আর কোনো সম্বন্ধ নাই—কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলিব না। শীঘ্রই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিব; এখনো হাত চলে,—এই বেলা লিখিয়া রাখি, আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ আর কেহ ইচ্ছা করেন,—লিখিবেন।

আমাদের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত ......গ্রামে। গ্রামখানি প্রকাণ্ড, অনেক ভদ্র লোকের বাস এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও বেশ সুসম্পন্ন। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল, এক্ষণে খারাপ। প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু মেরামতের অভাবে তাহা শ্রীহীন। পিতা দরিদ্র ছিলেন, কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতেন, তাহার উপর আমরা তিনটি ভগ্নী ও একটি ভাই।—আরও অনেক হইয়া মরিয়া গিয়াছে। আমার বড় দিদির বিবাহ দিতেই বাবার যাহা কিছু ছিল তাহা গিয়াছে। মেজ দিদির বিবাহ আমাদের পাড়াতেই হইয়াছে। তাঁর স্বামী তাঁর অপেক্ষা মাত্র তিন বৎসরের বড়; ছোট বেলা থেকেই দুজনে বেশ ভাব-সাব ছিল; তারপর যখন মেজদিদির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় এবং বাবা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে যাইতেছিলেন, তখন দাদাবাবু (মেজদিদির স্বামী) কলিকাতায় পড়েন, এবং সেই ভাবী পাত্রটি মাত্র এনট্রান্স পাশ অথচ দেড় হাজার টাকা চাহিয়াছে শুনিয়া বিনা টাকায় তিনি মেজদিদিকে বিবাহ করেন;—এজন্ত চারি দিকে তাঁহার ধন্য

ধনা পড়িয়া যায়। মোট কথা মেজদিদির রূপেই সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয় ভুলিয়াছিলেন, —এ ছাড়া বাল্য-প্রণয়ের অঙ্কুর তো ছিলই। সেই থেকে এখানকার ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার মুখার্জ্জী সাহেবের স্ত্রীর কাছে মেজদিদি লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিখিতে আরম্ভ করেন,—অবশ্য পূর্ব্বেও মেজদিদি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। দাদা বাবু মুখার্জ্জী সাহেবের বড় প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিবাহের এক মাস পরেই বড়দিদির মৃত্যু হয়। এখন আমরা তিন ভাই বোনে আছি। দাদা কলিকাতায় পড়েন, দাদা বাবু বাড়ীতেই থাকেন। এদিকে আমার বিবাহের বয়স হইয়া আসিল,—ত্রয়োদশ! লোকে বলিত আমি নাকি ভারি "সুন্দরী"। কেহ বলিত, "এমন রূপ রাজসিংহাসনেই শোভা পায়!" দাদাবাবু বড় বেহায়া, তিনি বলিতেন—"সরলা, আর দু'বছর পরে তোর দিকে আর চাওয়া যাবে না।" অর্থাৎ কিনা রূপের ঝলসে তাঁর চোখ ঠিক্‌রে যাবে—পুরুষ মানুষের চোখ কি না! ঠিক্‌রাইতে বড় বেশী ক্ষণ লাগে না! আমি বলিতাম,—"নীল চস্‌মা পরিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ো",—তিনি হাসিতেন।

বলা বাহুল্য বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। বাড়ীটি এর মধ্যেই বন্ধক পড়িয়াছে, বাবার অর্থ দিবারও তেমন ক্ষমতা নাই, এজন্য দত্ত মহাশয়ের মতই চোখ ঝল্‌সাক —আইবড় ছেলের বাপ জাতীয় যে এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা বড় ঘেঁসিতেন না। মানুষ যতই বা হোক, রূপচাঁদের চেয়ে রূপ সে কোথায় পাইবে! তাঁদের চোখ রূপে ঝল্‌সায় না। একটি কলেজের ছেলের নাকি আমাকে দেখিয়া মন কেমন করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মাতুল পড়ার খরচ দিতেন, অতএব রুধির চাই। তিনি শেষে ক্ষেপিয়া দেশান্তরী হইয়াছেন, কি কোনো ঔপন্যাসিক চরিত্রের মত রোমান্টিক্ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাহা খবরের কাগজে লেখে নাই।

একদিন বৈকালে বাবা হঠাৎ মাকে বলিলেন, "মেয়ে সাজাও।" সাজিবার খুব বেশী কিছু ছিল না, তবে যা-হয় করিয়া মেজদিদি আমায় দালানের কাছে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আমি এলো চুলেই গিয়া হাজির হইলাম, বাবা হাত ধরিয়া বসাইলেন, মেজদিদির মতলব আমার মাথা-ভরা কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি দেখানো,—তাই চুল বাঁধিলেন না।

আমি বড় বেহায়া,—ক্রমে নমুনা পাইবে। মেজদিদির মুখে শুনিলাম, যিনি দেখিতে আসিবেন সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। আবার "সংসার" করিবেন। এহেন রসের নাগর গুণের সাগরকে একবার ভাল করিয়া দেখিতে কোন্ মেয়েমানুষের না ইচ্ছা করে? কিন্তু চোখ তুলিতে লজ্জা করিতে লাগিল; তথাপি মরিয়া হইয়া, মাড়ি চাপিয়া, একবার চোখ তুলিয়া ফেলিলাম। গায়ে

পিরাণ, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পরণে মিহি কালোপেড়ে ধুতি, পায়ে সাদা মোজা, গায়ে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। চাপ দাড়ী, মাথায় তেড়ি, অধরে তাম্বুল-রাগ, চুল কালো। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে মেজদি মার কাছে বলিয়াছিলেন, "যে রকম মুখ তাতে বারো আনা চুল সাদা হইলে তবে মানাইত।" আমায় দেখিতে আসিয়া, দেখিলাম ভারি আহ্লাদ; যতক্ষণ ছিলেন, দাঁত কয়টি বাহিরেই ছিল,—সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে কি না! পুরুষ-মানুষেরা ভয়ানক প্রেমিক,—এক তিল প্রেম ভিন্ন থাকিতে পারেন না। কত উদ্ভ্রান্ত-প্রেমের প্রেমিকও নাকি বিবাহ করিয়া ফেলেন!—শত খুন মাপ।

তোমরা খেংরা লইয়া আসিবে—"কি! স্বামীর রূপের ব্যাখ্যা!" দোহাই তোমাদের—তখনো আমার বিবাহ হয় নাই, বিবাহের পর কি আর এ সব কথা মনে স্থান পাইত? ছি ছি! আর ঈশ্বরেরও বড় অন্যায়, তিনি কি অশুভ-ক্ষণেই মেয়েমানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার গায়ে আগুন চাপিয়া ধরিলেও পড় পড় করিয়া পুড়িয়া উঠে, মুখে কুই-নাইন পূরে' দিলেও মিষ্ট লাগে না, আর কানের গোড়ায় কেনেস্তারা বাজাইলেও ঝাঁটার বাড়ি দিতে ইচ্ছা করে,—অবশ্য পুরুষমানুষে এ সব বিশ্বাস করে না। বলিয়াছি তো, আমি বেহায়া; তোমরা খেংরাই মার, আর হাতা-বেড়ী পোড়াইয়াই মুখে দাও, আমি সত্য কথা বলিবই বলিব। আমায় দেখিবার সময় দু একটি প্রশ্নও করিয়াছিলেন. আমিও সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়াছিলাম,—ভারি খুসি!

২

বিবাহ যথাসময়ে এবং যথানিয়মেই হইয়া গেল। আমি ঘোমটা দিয়া বৌ সাজিয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিলাম। এখনকার মেয়েরা শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় বড় একটা কাঁদে না—কিন্তু আমি কাঁদিলাম, কেন কাঁদিলাম, তাহা তোমরা পুরুষ মানুষ কি বুঝিবে? তোমরা জানো মেয়ে মানুষের কান্না মায়া-কান্না, আর তোমা-দের আফিসের সাহেবের কানমলা খাইয়া যে কান্না তাহাই আসল কান্না। যাই হোক, আমি কাঁদিলাম। মা এবং মেজদিদিও কাঁদিলেন। যাইবার সময় মেজদিদি স্বামি ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ক স্ত্রী-জাতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, গভীর গবেষণা-পূর্ণ একটি সুদীর্ঘ লেক্‌চার দিলেন। মাও ত্রুটি করিলেন না।

এ সকল শিক্ষা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের যাহা হইয়া থাকে আমার তাহা অপেক্ষা কোনো অংশেই কম ছিল না। সাবিত্রী-উপখ্যান নলোপাখ্যান তো আমার কণ্ঠস্থই ছিল। পথে যাইতে যাইতে আবার সব ঝালাইয়া লইলাম, শানাইয়া রাখিলাম,—শ্বশুরবাড়ী গিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিব।

রেলের পথ, যাইতে প্রায় পাঁচ ছয়

ঘণ্টা লাগিল; পথে দশ পনেরোটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, আমার স্বামী মহাশয় পানের দোনা হাতে করিয়া আমায় পান দিতে আসেন, মুখে বলেন "নেও না নেও, আমার কাছে লজ্জা করিতে আছে?" মনে মনে বলিলাম, "একটুও না।" তোমরা যদি মেয়েমানুষ হইতে তবে বুঝিতে পারিতে, এই থিয়েটারী ধরণের লজ্জাভঞ্জন-রসাত্মক আপ্যায়িতে লজ্জা আরও ডাকিয়া আনে কিনা। যা'হোক তাঁর শ্রীচরণের দাসী সরলা সর্ব্বনাশী তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা পালনে ত্রুটি করে নাই।

আমি ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া ছিলাম। গ্রীষ্মকাল, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল। করি কি?—তোমাদের শাস্ত্রে বলে যে বিবাহ নামক লজ্জাকর ঘটনার পর হইতে এ বাঁদীর জাতির কালামুখ আর মনুষ্য-সমাজে দেখাইতে নাই!—কিন্তু তোমরাই নিয়ম করিয়াছ, আবার তোমরাই তবে অমন করিয়া মর কেন? তার সাক্ষ্য দেখ না কেন, যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, অমনি সব রসিক ছোক্‌রা টিকিট্-কলেক্টরের দল মেয়ে-কামরার সম্মুখে আসিয়া হাট বসাইতে লাগিল। নব্য রসিক প্যাসেঞ্জারের দল কেবল মেয়ে-গাড়ীর সামনে দিয়া অকারণ যাওয়া-আসা করিবে,—তার মধ্যে আমার স্বামীর বয়সীও অনেক থাকেন, মনে মনে বলিলাম, "মুখে আগুন তোমাদের!"

আমার কামরায় আমাদের জাতির আর একটি জীব ছিলেন,—সুন্দরী বটে, বয়সও অল্প, চোখে চসমা, পায়ে জুতা, হাতে একখানি ইংরাজি খবরের কাগজ, মুখ খোলা, চাহনি সপ্রতিভ এবং গম্ভীর। বুঝিলাম বিলাতী বাগানের দেশীয় ফুল! সুন্দরী বটে, বলিহারি রূপ! কিন্তু কৈ এর মুখের পানে তো কেহই চাহে না, যেন চাহিয়া থাকিতে সাহসই করে না! যত বক্র দৃষ্টি এই ঘোম্‌টার মধ্যে! একবার ভাবিলাম মুখটা খুলিয়া দিই, তাদেরও গোজন্ম সার্থক হোক, আমার মুখেও একটু বাতাস লাগুক, তাহা আর করিলাম না,—কি জানি যদি পাপ হয়!

একবার আমার স্বামী মহাশয় আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলে সেই স্ত্রী-লোকটি আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ ভদ্র লোকটি কি তোমার স্বামী?" তাহার উপর বড় রাগ হইল, কারণ দেখিলাম জিজ্ঞাসার সুরটি যেন একটু ব্যঙ্গ রসে মাখানো। কি করি?—ভদ্রতার খাতিরে তিন চারি বার ঢোক্ গিলিয়া উত্তর দিলাম "হুঁ"। বলি রাগ হয় না গা?—তোমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পথে যাইতে যাইতে হোঁচোট্ খাইয়া পড়িয়া যাও, তখন আগে চারি দিকে তাকিয়ে দেখ, কেহ দেখিতে পাইল কিনা; যদি দেখ অমুখ দেখিয়া ফেলিয়াছে, তবে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত কর কি না?

অবশেষে একটি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে, স্বামী মহাশয় মহা আগ্রহের সহিত গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিলেন,

"এস।" অতি লজ্জার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া জড়-ভরতের মত আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। গাড়ীর দরজার কাছে যেতেই স্বামী মহাশয় হাত ধরিয়া নামাইলেন এবং হাত ধরিয়াই লইয়া চলিলেন, লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সেখানে বাবা আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এখন সঙ্গে বাপের বাড়ীর পুরুষমানুষ কেহ নাই। মেজদিদির চাকরাণী হিমী সঙ্গে আছে, কিন্তু স্বামী মহাশয় আসিয়া নিজে আমার হাত ধরিলে সে আর কি করিবে—গো বেচারীর মত পেছনে পেছনে আসিতে লাগিল। গরম প্লাট্‌ফরমে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িয়া উঠিল। কিন্তু মেয়েমানুষের অনেক সয়—আমারও সহিল। যথাসময়ে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩

আজ আট দিন হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছি। বিবাহের আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার সবই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে বাবা আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু এখান হইতে স্পষ্ট জবাব গিয়াছে "এখন পাঠানো হইবে না;" কি জন্য তাহা পরে জানিতে পারিবে।

শ্বশুর-বাড়ীর পরিচয়ে তোমাদের বিশেষ লাভ নাই; তবে একটু শুনিয়া রাখ,—এদের বিষয়-সম্পত্তি বেশ আছে, বাড়ীটিও বেশ জম্‌কালো, উপর নীচে দশ বারোটি কুঠারী আছে, বাগান-বাগিচাও আছে, এঁরা দুই ভাই। আমার দেবর কলিকাতায় চাকরী করেন, স্বামী মহাশয় পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ীতে আছেন,—পেন্‌সনের বয়স অবশ্য হয় নাই, তবে চাকরী করিতে আর ভাল লাগে না বলিয়াই নাকি ইচ্ছা করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সপত্নী একটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আরও কতকগুলি নাকি হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কন্যাটিই বর্ত্তমানে বড়; কিন্তু সে বিধবা এবং শ্বশুরালয়েই থাকে—তাঁরা বিবাহের সময়েও নাকি পাঠান নাই, তাহার পক্ষে এ বিবাহ দর্শন করা বড় সুখকর হইত বলিয়াও বোধ হয় না। ছেলেগুলি ছোট, আহা তাদের মা নাই। সর্ব্বদা পিসীর কাছেই থাকে, আমার কাছে বড় আসিতে চাহে না। আমার ছোট জা'য়ের উপর ষষ্ঠীর কিছু বেশী রকম অনুগ্রহ দেখিলাম। পাঁচ ছেলে ছয় মেয়ে—এখনো বেশ বয়স আছে। তিনি আমায় দিদি না বলিয়া 'বড়-বৌ' বলিতে লাগিলেন। মানুষটি বেশ, কথাগুলিও বেশ মিষ্ট, স্বভাবটা যেন একটু ভাল মানুষ-গোছের। তিনটি মেয়ে পার করিয়াছেন। তারা শ্বশুর-বাড়ী থাকে, এখনো তিনটি বাকি। আমার ছেলেদের পোষ মানাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু তারা আমার কাছে বড় ঘেঁসে না—(তোমরা পুরুষমানুষেরা বলিবে, "কালামুখী? তোর বিয়ে না হ'তেই ছেলে-মেয়ে কোথা হতে আসিবে রে?"—প্রভু সকল, এ সব

তোমাদেরই মহিমা, তোমাদেরই লীলা!) সংসারে আর আছেন একটি বিধবা খোঁড়া রমণী—তিনি আমার ননদিনী রায় বাঘিনী। মানুষটি জবরদস্ত বটে। আমি আসা অবধি আমার লাগাম কসিয়া রাখিয়াছেন—দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, আসকারা পাইলে পাছে বেয়াড়া হইয়া যাই; আমিও ভয়ে জুজু হইয়া আছি—শক্তরে সবাই ভক্ত।

এ সব কথা যাউক, আমি এখানে আসিয়া অবধি স্বামি-সেবা-রূপ ব্রত অনুষ্ঠানের খুব প্রশস্ত সুযোগ পাইয়াছি। কয়জন ভাগ্যবতীর এমন জোর কপাল? ইতিপূর্ব্বেই আমার স্বামীর নাকি কি ব্যারাম ছিল—এ নাকি কি বিলাতী ব্যারাম, বড় মানুষদেরই হয়! আজ চারি দিন বড় বাড়িয়াছে,—শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, সেবা-শুশ্রূষা আমিই করিতেছি, সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় না, দুপুর বেলা একটু অ'াচল পাতিয়া গড়াগড়ি দিতে গেলে আমার ননদ ঠাকুরাণী তাঁহার আতার বিচির মত মিশি দেওয়া দাঁতগুলি বাহির করিয়া কর্কশস্বরে, আমার মাতৃ-পিতৃ-উচ্চারণ পূর্ব্বক, বুঝাইয়া দিয়া থাকেন যে, স্বামি-সেবা করিয়া আমার বিফল নারীজন্ম সার্থক করাইবার জন্যই তাঁহার সহোদর, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এই শেষ বয়সে, "পরের বালাই ঘাড়ে করিয়াছেন।" তাঁর সেই সময়কার মুখ-ভঙ্গিমা দেখিলে, ছোট বেলায় একবার চিড়িয়াখানায় গিয়া ছিলাম, তথাকার এক প্রকার জীবের কথা মনে পড়িত।

জামাতার অসুখের কথা শুনিয়া বাবা দেখিতে আসিয়াছেন, আর অনুনয় বিনয় করিয়া যদি অনুমতি পান, তবে আমাকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু আমার স্বামীর অসুখ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বেশী কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, বাবা ফিরিয়া গেলেন। আমার স্বামী আজ কাল আমায় আর বড় কিছু বলেন না; আমায় দেখিতে যাইয়া তাঁর মুখে যে হাসির প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, আজ কাল তাহা নিবিয়া গিয়াছে! তাহাতে আর তেল নাই—শুষ্ক সলিতা আছে মাত্র।

একদিন আমি ঘরে গেলে, কিছুক্ষণ ম্লান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন; আমি জড়োসড়ো হইয়া, ঘোমটা টানিয়া, দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জল; ছল্‌-ছল্‌-চক্ষে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণকাতর-স্বরে আমায় বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করিয়ো, আমি মহাপাতকী, আমি নর-রাক্ষস, বুঝিবা জন্মের মত তোমায় ভাসাইলাম,—" কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মনোবেগ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিলেন—"ধিক্‌ আমাদের সমাজের নিষ্ঠুরতাকে,—আমার মত পাষণ্ডের শাসন নাই! পুরুষেরা যতদিন আমাদের

সমাজে যথেচ্ছাচার—” কি বলিতে যাইতে ছিলেন, আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। জল চাহিলেন, জল খাওয়া বারণ, ডাবের জল ছিল, আনিয়া পান করাইলাম, আমার কান্না আসিয়াছিল, চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্য হইতে যেন কি-একটা ভারী পদার্থ উঠিয়া আসিয়া কণ্ঠে বাধিয়াছিল, ঢোক গিলিতে পারিতেছিলাম না। কি মনে হইয়া যে তখন কান্না আসিতেছিল, এখন তাহা ভাল মনে নাই—সে আজ দশ বৎসরের কথা। ডাবের জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিলেন—“তোমার দাদা, শীঘ্র ডাক্তারি পাশ করিবেন, ঈশ্বরেচ্ছায় দু’পয়সা রোজগার করিবেন, তোমার কষ্ট হইবে না। এখানে থাকিয়ো না—” উপযাচক হইয়া এক দিনও কথা কহি নাই, আজ কহিলাম,—জিজ্ঞাসা করিলাম, “আজ কি শরীর বড় খারাপ?” তিনি বলিলেন, “না না, তেমন খারাপ নয়, বেশ আছি, তবু—” কি জানি কেন, আপনা আপনিই যেন দময়ন্তীর সেই কথাটি মনে আসিল,—আপন মনে বলিতে লাগিলাম :—

“যদি মাং ত্বং মহারাজ ন বিহাতুমিহেচ্ছসি।
তৎ কিমর্থং বিদর্ভাণাং পন্থানং মাং
উপৈবাসি॥

আবার ভাবিলাম “কি জানি—আমি কি বুঝি? মন্দ কথা ভাবিতে নাই—আর ভাবিব না।” এমন সময় সিঁড়িতে জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইল, বুঝিলাম ডাক্তার বাবু আসিতেছেন, আমি আমার জায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তখন অপরাহ্ণ, ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে আমার ননদ আমায় বলিলেন, “বড় (!) বৌ, আজ তুমি ছোট বৌএর ঘরে শুইয়ো, এ ঘরে আর তোমার আজ শুইবার দরকার নাই—ও ঘরে আর যেয়ো না।” তথাস্তু। মনে করিলাম আজ বুঝি ভালই আছেন, তবে? আমার মলের শব্দে হয়তো তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হইবে, এই জন্য যাইতে বুঝি বারণ করিলেন। আর আজ বুঝি ঠাকুরঝির আমার উপর দয়া হইয়াছে, তাই আমায় আজ ঘুমাইতে দিবেন। আজ আর তবে ওদিকে যাবো না। আমি অনেক সময় অনাহূতভাবেই “তাঁর” ঘরে যাইতাম—বিয়ের ক’নে হ’লে কি হয়? বড়বৌ যে!

রাত্রে যথাসময়ে আমার জায়ের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, তাঁর কোলের মেয়েটি এরই মধ্যে আমার বড় ‘নেওটো’ হইয়াছে, সে তাহার মায়ের কাছ থেকে উঠিয়া আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল, বলিল, “দেতাইমা, আমি তোমাল কাছে ছোবো।” তাহাকে কোলের মধ্যে লইয়া শয়ন করিলাম। একে তো মেয়েমানুষের ঘুমের বদ্‌নাম আছেই, তার উপর আজ বিছানার উপর শুইয়াছি (অন্য দিন আমি প্রায় আঁচল পাতিয়া “তাঁর” পালঙ্কের নিকটে মেঝেয় শুইতাম), মনটাও একটু সুস্থ আছে, কারণ মনে করিলাম, আজ বুঝি ডাক্তার বাবু

অনেকটা ভাল দেখিয়া গিয়াছেন, তন্দ্রা আসিতে লাগিল, কিন্তু কি-জানি-কেন, পূর্ণ-নিদ্রা আসিল না।

অন্য দিন জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকি, আজ একটু হাতাপাতা মেলাইয়া একটু আরাম করিয়া শুইয়াছি। গ্রীষ্ম-কাল, ঘরের জানালা সব খোলা ছিল, নৈশ নিদাঘের মৃদুমন্দ সমীরণ জানালা দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া ঘরে আসিয়া, আমার পরণের ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়-খানিকে এখানে-ওখানে ইচ্ছামত নাড়া চাড়া দিয়া, কখনো বা কাপড় ফুঁড়িয়া আমার ঘর্ম্মাক্ত চর্ম্মে একটু ফুঁ দিয়া, আবার অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া, আবার কাহার ঘরে, আমার মত কাহারো সঙ্গে রসিকতা করিতে চলিল। কোনো বালাই নাই। মনে ভাবিলাম "বাপু! এখন বড় স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছ, পরকালের ভাবনা একবার ভাবিতেছ না। একবার মেয়েমানুষ হইয়া জন্মাইয়া স্বামি-সেবা কর, নহিলে স্বর্গে যায়গা পাবে না যে—" কে শোনে? আমার সর্ব্ব শরীরে অলসের মদিরা ঢালিয়া রাখিয়া অম্লান-বদনে চলিয়া গেল। আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম "আমার তো বিবাহ হইল, সকলেরই হয়। আমারও হইল, মেজদিদি দাদাবাবু, মা সকলে শিখাইয়াছেন স্বামী দেবতা, আমি তো এখন দেবতা পাইয়াছি; কিন্তু আমি ছেলে মানুষ, দেবতা লইয়া কি করিব? দেবতা লইয়া কি করিতে হয়? আমায় কে শিখাইবে! বুঝি মানুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে আমার আহ্লাদ হইত। আচ্ছা, মানুষের সঙ্গে দেবতার কেন বিবাহ হয়? সকলের স্বামীই কি তবে দেবতা? কৈ, দাদাবাবুকে তো কেমন মানুষের মত বোধ হয়। হায়! আমার স্বামী যদি একটু মানুষের মত হইতেন! তাঁর অসুখ, মুখের দিকে তাকাইলে বড় দুঃখ হয়, মেজদিদির শ্বশুরের যখন বড় অসুখ করিয়াছিল, তখন তাঁর দিকে চাহিয়া আমার ঐ রকম বড় দুঃখ হইত। মা কালী, তাঁকে ভাল কর। তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমায় তিনি সব বুঝাইবেন, কি করিলে তাঁর তৃপ্তি হয় আমি কেমন করিয়া বুঝিব? ঠাকুরঝি যাহা করিতে বলেন আমি তাই করি। তাহাতে কি তাঁহার সেবার ত্রুটি হয়? আমার কি পাপ হয়? তবে কি হবে?—এবার আমি বাড়ী গিয়া মেজদিদির কাছে ভাল করিয়া শিখিব।"

হাই উঠিতে লাগিল, চোখ টানিতে আরম্ভ করিল, ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৪

পর দিবস প্রাতে বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, এলো থেলো হ'য়ে এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিলাম, হঠাৎ যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল, —ব্যাপারখানা কি!

তখন নেহাত খুকীটি নই,—ঠাকুরঝির রোদনের বাক্যবিন্যাসেই সব বুঝিলাম,—আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমার তখনকার মনের ভাব আমি তখন নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তা আর আজ দশ বৎসর পরে মনে করিয়া তোমাদের কি বুঝাইব?

আমার তখন যে কি ভাবিতে হইবে, কি করিতে হইবে, ঘর থেকে বাহির হইব কি না, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। বেশ শুনিতে পাইলাম, ঠাকুরঝি কাঁদিয়া আছ্‌ড়ি পিছ্‌ড়ি করিতেছেন, আর কপাল ভাঙিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিতেছেন "ওরে কি কালনাগিনী বৌ ঘরে এনেছিলাম রে—" ইত্যাদি। বুঝিলাম এই সর্ব্বনাশীই যত অনর্থের মূল।

স্বামী মরিলে কাঁদিতে হয়, এটা বুঝিবার মত বয়স তখন আমার হইয়াছিল; কিন্তু আমার ঠিক যে তখনই কান্না আসিয়াছিল, তাহা নহে। বলিয়াছি তো, আমি তখন কি করিব, কি ভাবিব, কার কাছে যাইয়া দাঁড়াইব, কিছুই বুঝিয়া পাইতেছিলাম না। একটু পরে কিন্তু আমি কাঁদিয়াই ফেলিলাম, চোখ রগ্‌ড়াইয়া রগ্‌ড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া যেন আমার বড় তৃপ্তি হইতে লাগিল, কিন্তু তখন মনে কি ভাবের উদয় হইয়া কাঁদিতেছিলাম তাহা আমার যেন এখন ঠিক মনে আসিতেছে না। যেন তাহা অনেকটা অভিমানেরই কান্না, যেন কোনো আপনার জনের হাতে মার খাইয়াই সে কান্না। যেন মা ও মেজদিদি ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছিলাম, ডাকিয়া লইয়া যান নাই, যেন সেই ঘুম থেকে উঠিয়াই এই কান্না; কিম্বা যেন বাবা, মা, দাদা, ও মেজদিদির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, পথে প্রান্তরের মাঝে আমি হারাইয়া গিয়াছি, আর এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, কালো মেঘে আকাশ ছাইয়াছে, ঝক্‌মক্‌ বিদ্যুৎ চমকিতেছে, যে যাহার আশ্রয় পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,—আমার পানে কেহ চাহিতেছে না, আর আমি বালিকা, একাকিনী, প্রান্তরমাঝে নিরাশ্রয়া, পথহারা, অনাথিনীর মত কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। কড় কড় মেঘগর্জ্জনে আমার সে ক্রন্দনধ্বনিও ঢাকিয়া ফেলিতেছে,—এ যেন ঠিক সেই কান্না। এত দিন পরে তোমাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কান্না কেমন কান্না? সে কান্নার মধ্যে রাগ, দুঃখ, অভিমান এই তিনে মিশিয়া কেমন একটা কি ভাব,—তাহাতে শোকের চিহ্নমাত্রও ছিল না। সে কান্না স্বামিশোকের কান্না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়,—তাহা আমি বলিতে বসি নাই।

* * *

সপ্তাহ কাল অতী—আমি বিধবা হইয়াছি। বাবা আসিয়াছেন, আমায় লইয়া যাইবেন, এবার অনুমতি পাইয়াছি, আজ মার কাছে যাইব, মেজদিদির কাছে যাইব, দাদা বাবুর কাছে যাইব।

যে দিন আমি আইবড় মেয়ে চুল এলো করিয়া —র সম্মুখে আসিয়া রূপ দেখাইতে বসিয়াছিলাম, সেদিন হইতে আজিও এক মাস অতীত হয় নাই, এলো চুল ছিল, বাঁধা হইল, আবার এলাইয়া বাড়ী চলিলাম, সাদা সিঁথি ছিল, সিন্দুর পরিলাম, আবার মুছিয়া বাড়ী চলিলাম। বাবার কাছে গহনা পরিতে পাই নাই,—গা-ভরা গহনা পাইলাম, পরিলাম, আবার খুলিয়া বাড়ী চলিলাম। এক মাসের মধ্যে আমার সব হইল, সব ফুরাইল! মুহূর্ত্তমধ্যে জন্মিলাম, বাড়িলাম, মরিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে ফুটিলাম, ঝরিলাম, শুকাইলাম। মুহূর্ত্ত কালের জন্য জ্বলিয়া উঠিলাম, তখনি নিবিলাম। আজ আমার সব ফুরাইল! সবই কি ফুরাইল? না, কেবল সুখের দিন ফুরাইল—দুঃখ কি ফুরায়?

আমার "আড়াই দিনের বাদসাহী" আড়াই দিনেই শেষ হইল, আমার জীবন-নাটকের একই গর্ভাঙ্কে কুমারী সাজিলাম, এয়ো সাজিলাম, বিধবা সাজিলাম। তিন লীলা একই আসরে দেখাইলাম। আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, একই পরিচ্ছেদে সম্পন্ন হইয়া গেল। আর কি চাই? "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি"র প্রতীক্ষায় বাবার সঙ্গে বাড়ী চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
এম, এ।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ অধ্যায়।

আদম পুরা।

বারাণসীধামের উত্তর-পূর্ব্ব দিক ব্যাপিয়া আদম পুরা মহল্লা অবস্থিত। উত্তরে রেলওয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে কোতোয়ালী, দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে জাইত পুরা। মহল্লার দক্ষিণাংশ ভেদ করিয়া চেতগঞ্জ হইতে রাজঘাট এবং মচ্ছোত্রি হইতে পুল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা চলিয়া আসিতেছে। রাস্তা ও নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বাটীগুলি পাকা এবং মধ্যবিৎ হিন্দুদিগের দ্বারা আবাসিত। মহল্লার কেন্দ্রটি কাচা এবং গরীব মুসলমানদিগের আবাস-ভূমি। উত্তর দিকে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে "লড্ডু সুরিয়া" এবং "গোয়াল গদ্দাই" সুবৃহৎ। এই স্থান হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। তিলিয়া নালা ঘাট হইতে

বরুণার উপরিস্থ পুলকোহানা নামক সেতু পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আড়ভাবে মিলিত হইয়া সারনাথ-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এ স্থানটিতে ধ্বংসাবশেষ চিহ্নগুলি বিদ্যমান আছে। এখানকার বাজারগুলির প্রসিদ্ধি নাই। যতদিন নদীর বাণিজ্য ছিল, ততদিন স্থানটিও বর্দ্ধিষ্ঠ ছিল। এখন নদী অতিক্রম করা সহজ হওয়াতে বাণিজ্যটি লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং স্থানটিও অবনতি-দশাপ্রাপ্ত। পুরাকালে যে এই স্থানটি বহুজনাকীর্ণ ছিল, বহু পুরাতন বাটীগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মচ্ছোদ্রী পুষ্করিণী একণে মিউনিসিপাল উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে কামেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। কিন্তু পুষ্করিণীর অনস্তিত্বে জলসমাসমও বিরল হইয়াছে। তিলিয়া নালার সন্নিকটে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ আছে। ইহা স্তম্ভত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিরোদেশে গম্বুজ শোভা পাইতেছে। লোকের বিশ্বাস যে ইহা বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুলজার মহল্লায় মকদম সাহেব নামে একটি সমাধিস্থান আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে একটি মসজিদ আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। রেলওয়ের পরেই পালং সাহিদ নামে একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে হইতে বরুণার তট পর্য্যন্ত বহু পুরাতন বাটীর অস্তিত্ব দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এখানে পূর্ব্বে লোকেরা বাস করিত, কিন্তু তাহা একণে ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আদম পুরা মহল্লায় লাট ভৈরব নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রস্তর স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে একটি মন্দির ছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের হাঙ্গামায় এই স্তম্ভটিকে মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া ফেলে। হিন্দুরাও প্রতিহিংসা স্বরূপ মসজিদটি চূর্ণ করিয়া ফেলে। উত্তর দিকে মুসলমানদিগের গোরস্থান আছে, তন্মধ্যে রওজা অবস্থিত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জাইতপুরা।

আদম পুরার পশ্চিম দিকে জাইত পুরা মহল্লা অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে চেতগঞ্জ, উত্তরে রেলওয়ে এবং দক্ষিণে কোতোয়ালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর দিকটা ফাঁকা, নালা ডোবা, মাটির ঢিবি প্রভৃতির অভাব নাই—স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যও হইয়া থাকে। পশ্চিমার্দ্ধটাও ন্যূনাধিক পরিমাণে ফাঁকা—উদ্যান এবং সুন্দর অট্টালিকা যে নাই তাহা নহে। পূর্ব্বার্দ্ধের কেন্দ্র-স্থানটি কাঁচা। মুসলমান এবং ইতর শ্রেণীর হিন্দুগণ এইখানে বাস করে। এখানকার মুসলমানেরা কিংখাপ বুনিয়া থাকে। দক্ষিণ দিকে লোকের আবাস এবং ইহাই অওসান গঞ্জের ব্যবসায় স্থান। অওসান গঞ্জটি বাবু অওসান সিংহ দ্বারা স্থাপিত। পল্লীটি সুবৃহৎ, ইহাতে বাজারও আছে। ইহার সন্নিকটে যোগেশ্বরের মন্দির। ইনি ধনাঢ্যদিগের উপাস্য

দেবতা। যোগেশ্বরের মন্দিরের মেজেটা পালিশ করা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দ্বারের সম্মুখে একটি ষাঁড়-মূর্ত্তি আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা দেবগণ সমবেত হইয়া হোম করিতেছিলেন, এমন সময়ে আহুতি-প্রদত্ত বস্তু ভেদ করিয়া প্রস্তরাকারে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। মূর্ত্তির ঠিক উপরে একটি পাত্র আছে। গ্রীষ্মকালে পাত্রটিতে জল রক্ষিত হয়। ছিদ্র দিয়া বারিবিন্দু মূর্ত্তির উপর পতিত হইতে থাকে। নিকটে নাগকূপ নামে একটি পুরাতন কূপ আছে। কবে যে নাগকূপ খনন করা হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। কাশীখণ্ডে কিন্তু ইহার উল্লেখ আছে। কূপের সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত। জলের নিম্নদেশে একটি লৌহচাদর নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার নিম্নে আরও একটি কূপ বিদ্যমান আছে। উক্ত কূপে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। একটা সিঁড়িতে তিনটা সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত। মেজেতে মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। শ্রাবণ মাসে একটি মেলা হয়। মেলাটি দুই দিন থাকে। প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা এবং দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ মেলায় আসেন। এই সময় নাগেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। কাইত পুরার উত্তর দিকে ব্যাঘ্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পশ্চিম দিকে সতী ইমলী নামক স্থান। এখান হইতে রামলীলার সমারোহ আরম্ভ হইয়া চিত্রকোটে যাইয়া সমাপ্ত হয়। জগৎগঞ্জে চিত্রকোট নামক স্থান অবস্থিত। বাবু জগৎ সিংহ জগৎগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। সারনাথের উপকরণাদি লইয়াই তিনি এই গঞ্জ স্থাপন করেন। সতী ইমলী রাস্তা হইতে মণ্ডপ্রস্তুতের স্থান পর্য্যন্ত ঈশ্বর গাঙ্গী নামক যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ভাদ্র মাসে "কজরি মেলা" হইয়া থাকে। মেলার দিনে রমণীগণ উপবাস করে এবং ঈশ্বর গাঙ্গীতে স্নান করিয়া থাকে। উক্ত মেলায় জনতা কম হয়। ভদ্র ব্যক্তির সমাগম এই মেলায় হয় না। ঈশ্বর গাঙ্গীতে একটা পুরাতন কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই কূপের নিম্ন প্রদেশে একটা রাস্তা অবস্থিত, তদ্দ্বারা এলাহাবাদে গমন করা যাইতে পারে। অপর জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত রাস্তা পাতালপুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অওসান গঞ্জের সন্নিকটে বড় গণেশের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এখানে তীর্থ-সেবীদিগের বিশেষ ভীড় দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ঠা ভাদ্র এখানে "ঢেলা চৌথ মেলা" হইয়া থাকে। রাত্রে নষ্টচন্দ্র দেখিয়া লোকে অপরের বাটীতে ঢেলা নিক্ষেপ করে। লোকের বিশ্বাস নষ্ট চন্দ্র দেখিলেই সে বৎসরে সে কোন অপকর্ম্মে বৃথা অভিযুক্ত হইবে। সুতরাং মুক্তির উপায় লোকের বাটীতে ঢেলা ফেলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পুলিশ কিন্তু এই অপকর্ম্মটি আংশিক রোধ করিয়াছে। এই পল্লীর পূর্ব্ব দিকে দারা নগর। ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা

সিলো এই স্থানে বহুকাল যাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। অদূরে "আড়াই কাঙ্গুরা" নামক একটী মসজিদ বিরাজিত। বারাণসীধামে যে কয়েকটি সুন্দর মসজিদ আছে তন্মধ্যে "আড়াই কাঙ্গুরা" একটি। আরও উত্তর দিকে আলাইপুরা মহল্লায় "বকরিয়া কুণ্ড" নামে একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহু পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস যে, সেগুলি বৌদ্ধদিগের। ১লা জ্যৈষ্ঠ "বকরিয়া কুণ্ডে" গাজিমিয়ার "গাজিমিয়া" মেলা হইয়া থাকে। এ মেলাটি মুসলমানদিগের। সুলতান গজনবির ভাগিনেয়ের সম্মানার্থ এই মেলা হইয়া থাকে। উক্ত সুলতান তাঁহার শ্যালক সালারসাহকে ভারতবর্ষে কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন। প্রবাসকালে তাঁহার স্ত্রী সাতারি মুল্লা আজমির সহরে একটী পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রটি সালার মসুদ নামে খ্যাত। ইনি উনবিংশ বৎসর বয়ক্রমে হিন্দুদিগের সহিত রণে হত হন। অযোধ্যার অন্তঃপাতী ব্যারাইচ নামক স্থানে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য ইনি প্রাণোৎসর্গ করেন বলিয়াই ইনি পরে মুসলমান উস-সুহদা নামে খ্যাত হন। গাজিমিয়ার মেলায় নীচজাতীয় হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য যে, পাপস্রোত অবাধে বহিয়া থাকে। বকরিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে ফকরুদ্দিন আলাইয়ের দর্গা অবস্থিত। উক্ত কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৬০০ গজ দূরে ৩২ খম্বা নামে একটী সমাধিস্থান আছে। ইহা ৩২টি স্তম্ভোপরি স্থাপিত। কতকগুলি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলাতে ইহা ২৪টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান আছে। লোকের বিশ্বাস যে, ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পিতৃভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তিনি প্রফুল্লকে বসিতে বলিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল বসিলেন না। প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়া রমার মাতা ভীতা হইলেন। কি যে একটা ঘটিয়াছে তাহা তিনি অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্ব দিবসে প্রাপ্ত পত্র দুইখানি প্রফুল্ল রমার মাতার হাতে দিয়া বলিলেন "মা, আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, শঠ, আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনারও অযোগ্য। মা, এ হতভাগ্য আজি জন্মের মত আপনার নিকটে

বিদায় লইতে আসিয়াছে। এ অভাগাকে বিস্মৃত হইয়া যাউন্—মনে করিবেন—"। প্রফুল্ল আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, অশ্রু আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রমার মাতা বিস্মিত হইয়া কিয়ংক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রফুল্লের সহিত একটী কথা কহিবারও তিনি অবকাশ পাইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে প্রফুল্লের প্রদত্ত পত্র দুই খানি পাঠ করিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা করিয়াছিলাম, তার ফল এই প্রকারই হওয়া উচিত!"

৫

আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে নব বর্ষার মধুর যামিনীতে প্রফুল্ল কুমার জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি কোন ওজর আপত্তি করিলেন না, শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ করিয়া অনুপমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনুপমা তাঁহার ইহ পর লোকের সঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নী হইলেন। কিন্তু তিনি যে, এ বিবাহে আন্তরিক সুখী হয়েন নাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। আনন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কারণ এ, পি, ঘোষ গহনায় ও নগদে সর্ব্বসমেত প্রায় আট হাজার টাকা দিয়াছিলেন, ফুলশয্যা প্রভৃতিতেও বিস্তর মূল্যবান্ সামগ্রী দিয়াছিলেন। দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলে এ, পি, ঘোষের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বধূ দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন "যেমন ছেলে সে রকম বৌ হয় নি।" আবার অনেকে বলিলেন "তা হোক, তা হোক্ বয়েস হোলে বেশ হবে, বড় ঘরের মেয়ে এ রকম হোয়ে থাকে।" এ প্রকার প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বুঝিলেন এ প্রশংসা নব বধূর নহে, বধূর ধনবান্ পিতার ধনের। হায়! রমা! তুমি যদি ধনাঢ্যের কন্যা হইতে!

প্রফুল্লের বিবাহ তো হইয়া গেল, কিন্তু প্রফুল্লের বিবাহের নিমিত্ত যাঁহার এত আগ্রহ ছিল, প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া যিনি 'চরিতার্থ' হইবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রফুল্লের সেই পিতামহী প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন কি? না। একে তো বধূ প্রফুল্লের অনুরূপ সুন্দরী নহে—তাহাতে বধূর যেরূপ উদ্ধত গর্ব্বিত স্বভাব, বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কত যত্নের, কত সাধনার প্রফুল্লের বৌ, বৃদ্ধার ইচ্ছা নাতবৌকে কোলে নিয়ে আদর করেন, কাছে বসিয়ে উপকথা বলেন, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বৌ উপকথার নাম শুনিয়া হাসেন! যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক

প্রফুল্ল আজিও ঠাকুর মার কাছে বসিয়া উপকথা শুনিতে ভাল বাসেন, তাঁহার পত্নী বৃদ্ধার উপকথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসেন। তিনি বৃদ্ধাকে ভূতগ্রস্ত রোগী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধার নিকটে বসিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। স্ত্রীর ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইতে লাগিলেন। কোথায় সরলা রমা, আর কোথায় এই গর্ব্বিতা অনুপমা? প্রফুল্ল বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতেন, এবং "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ভাবিয়া পিতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেন। এইরূপ নৈরাশ্য ও অশান্তিতে প্রফুল্লের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এম, বি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্র্যাকটীস্ করিতে সক্ষম হইলেন না।

যাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, জীবনে সুখ নাই, মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সে লোকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবে কি প্রকারে?

যদি অনুপমার স্বভাবটী এরূপ না হইয়া কোমল হইত, তাহা হইলে বোধ হয় প্রফুল্লের এত কষ্টের কারণ হইত না। কর্ত্তব্যের ভার বলিয়াও তিনি মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিতেন, কিন্তু অনুপমার এই প্রকার কঠোর গর্ব্বিত স্বভাব তাঁহাকে আরও যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

আমাদের দেশের কোনও বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন "যাহারা বিষয় করে, তাহাদের প্রাণে অহঙ্কার থাকে না, কিন্তু যাহারা সে বিষয় ভোগ করে তাহারা ধরাকে প্রায়ই সরা জ্ঞান করিয়া থাকে। আমাদের ব্যারিষ্টারদুহিতা অনুপমা এ কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দিবা রাত্রি এইরূপ মনাগুনে দগ্ধ হইয়া প্রফুল্লের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। আজ জ্বর, কাল পেট ফাঁপা, তার পরদিন পেটের অসুখ, এই রকমে তাঁহার অর্দ্ধেক দিন আহার বন্ধ হইয়া গেল। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল, পিতামহীর মৃত্যু হইল। তাহাতে প্রফুল্লের প্রাণে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা অবর্ণনীয়।

মনের কষ্টেই হউক, কিম্বা এক মাস অশৌচ পালনের জন্যই হউক, এই সময়ে প্রফুল্লের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রফুল্লের চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে পীড়ার হেতু অন্তরে, বাহিরে তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি ফল দর্শিবে?

চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন "অম্বল", কেহ বলিলেন "ডিস্পেপ্সিয়া", আবার কেহ বা অন্য রোগের নাম করিলেন।

যাই হউক রোগের উপশম করিতে কেহই সক্ষম হইলেন না। অবশেষে চিকিৎসকগণের চিরপ্রথামত সকলে একমত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

আনন্দ বাবুও তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। আনন্দ বাবু গোড়া কাটিয়া আগায় বিস্তর জল ঢালিতে লাগিলেন। দরিদ্রকন্যা রমাকে উপেক্ষা করিয়া, প্রফুল্লকুমারের চিরপোষিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে বৃথা ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু বড় আগ্রহে "বড় কুটুম্ব" করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি যে স্বয়ং বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। চিকিৎসকগণ যখন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তখন আনন্দ বাবুর চিন্তার পরিসীমা রহিল না। তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনুপমা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তাহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হইল। অনুপমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করাতে প্রফুল্ল বাস্তবিক কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন, কারণ অনুপমার ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রণা পাইতেন। গর্ব্বিত অনুপমা সদ্ব্যবহার দ্বারা পীড়িত স্বামীর মনস্তুটি সাধন করা দূরে থাক, সর্ব্বদাই স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিত।

ধীরপ্রকৃতি প্রফুল্লকুমার পিতামাতাকে এ সকল কিছু জানিতে দিতেন না। তিনি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে গোপনে রাখিতেন।

তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ বিজয় তখন তাঁহার নিকটে ছিল না। বিজয় চাকুরী গ্রহণ করিয়া সুদূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা খুলিয়া বলিবার লোক আর কেহ ছিল না।

হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া তিনি নীরবে দিনপাত করিতেন।

এলাহাবাদের ষ্টেষণ মাষ্টার আনন্দ বাবুর স্বদেশবাসী এবং বাল্যবন্ধু। বিদেশে একজন পরিচিত লোক থাকিলে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আনন্দ বাবু এলাহাবাদে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করিলেন।

কলিকাতার বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে স্ত্রী সুকুমারী এবং পুত্র প্রফুল্লকুমার, আর একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভৃত্য লইয়া এলাহাবাদে রহনা হইলেন। ষ্টেষণ মাষ্টার নিত্যানন্দ বাবুকে বাসার জন্য পূর্ব্বেই পত্র লেখা হইয়াছিল। ট্রেণ যথাসময়ে এলাহাবাদ ষ্টেষণে পৌঁছিলে নিত্যানন্দ বাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দ বাবুকে সপরিবারে নিজের বাসায় সমাদরে লইয়া গেলেন। তিনি আনন্দ বাবুর নিমিত্ত গঙ্গার ধারে একটী অতি সুন্দর বাসাবাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন সে

বাসায় তাঁহাদের যাওয়া হইল না। আনন্দ বাবু বাল্য-বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, সে দিন সপরিবারে নিত্যানন্দ বাবুর বাসাতেই রহিলেন। পথশ্রমে প্রফুল্ল বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বাবু অতি যত্ন সহকারে প্রফুল্লকুমারকে অন্দরমধ্যে লইয়া গেলেন। প্রফুল্ল ক্লান্ত দেহ লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িলেন। তাঁহার বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া তিনি কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী প্রফুল্লের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ বাবুর আলয়ে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন আর কোন আত্মীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বাবু তাঁহার ভৃত্যকে প্রফুল্লের জন্য গরম দুধ আনিবার আদেশ করিয়া আনন্দ বাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুকুমারী ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিলেন। প্রফুল্লকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত দুধ লইয়া নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী স্বয়ং আসিতেছিলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে আনন্দ বাবু ও নিত্যানন্দ বাবু থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। দ্বারের পার্শ্বে তাঁহার মলের শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়া নিত্যানন্দ বাবু ডাকিলেন "এস, ভিতরে এস?" হাতে দুধের বাটী, বালিকা একপদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। নিত্যানন্দ বাবু আবার ডাকিলেন "এস না, ভিতরে এস না, তোমার এত লজ্জা কেন রমা! আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি দুধটা প্রফুল্লকে দিয়ে যাও।" এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু আনন্দ বাবুর সঙ্গে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 'রমা' নাম শুনিয়া প্রফুল্ল চকিতের ন্যায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হায়! এ নাম যে প্রফুল্লের হৃদয়ের পত্রে পত্রে লেখা রহিয়াছে! এ নাম তিনি কি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন? আজ পাঁচ বৎসর এ নাম প্রফুল্ল কাহারও মুখে শুনেন নাই। নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী দুধ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রমাও এক বার প্রফুল্লকে দেখিয়া লইলেন। প্রফুল্ল অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী দেখিয়া প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "রমা? রমা তুমি এখানে? তুমি এই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পরিণীতা স্ত্রী?" কি দারুণ অত্যাচার! হায়! প্রফুল্ল আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। একে দুর্ব্বল শরীর, তাহার উপর এই অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা হেতু যখন প্রফুল্ল কুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তাঁহার পীড়া অতি সঙ্কট-

জনক হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল বটে, কিন্তু উত্থান-শক্তি আর রহিল না।

তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল। স্থানীয় চিকিৎসকেরা অনেক যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তাঁহারা প্রফুল্লের জীবন সম্বন্ধে এক প্রকার হতাশ হইলেন। তখন আনন্দ বাবু নিজকৃত কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিলেন। বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে সুকুমারীরও অনুতাপের সীমা রহিল না! রমার রূপ, রমার সরলতা, রমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন "হায়? ইচ্ছা করিলেই এই দেবীতুল্য বালিকাকে আমার কুললক্ষ্মী করিতে পারিতাম! নিজের দোষে নিজে এই স্বর্ণপ্রতিমা হারাইয়াছি। আমাদেরি দোষে আমাদের একমাত্র পুত্র এই দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে।"

তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই দেবীপ্রতিমা লাভে বঞ্চিত হইয়াই প্রফুল্লের আজি এই দশা!

কিন্তু তখন বুঝিলে আর কি ফল? মানুষ এত অল্পবুদ্ধি যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন কায করিতে পারে না, বর্ত্তমানই মানুষ বোঝে ভাল! শেষে অনুতাপের বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। আনন্দ বাবু ও সুকুমারীরও তাহাই হইল।

এখন তাঁহারা বুঝিলেন অর্থ ক্ষণস্থায়ী, শান্তিই মানুষের জীবনের প্রধান বাঞ্ছনীয়!

এখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যদি প্রফুল্লকুমারের জীবন রক্ষা না হয়, তবে এ অগাধ সম্পত্তি লইয়া কি হইবে? এখন আনন্দ বাবু স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া নিজের বুদ্ধিকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই যে, রমা আবার কি প্রকারে প্রফুল্লের অদৃষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল? তাহা জানিবার জন্ম যদি পাঠিকা ভগ্নীদিগের কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে শুনিয়া যান!

পিতার পত্র পাইয়া প্রফুল্লকুমার তো রমার আশা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন! আনন্দ বাবুও নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এ দিকে রমার মাতা কন্যা লইয়া মহা-বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সংসারে যাহার অর্থ নাই, তাহার কিছুই নাই, অর্থ না থাকিলে আজকালকার বাজারে কি মেয়ের বিবাহ হয়? রমার মাতা যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ী গৌরীপুরে। রমার মাতা যখন কন্যা লইয়া বিব্রত, সেই সময় নিত্যানন্দ বাবু কোন কার্য্য উপলক্ষে বাটীতে আসিয়া-

ছিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি রমার কথা শুনিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টের ফলে তাঁহার দুই স্ত্রীই কয়েকটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। বিপত্নীক নিত্যানন্দ বাবু রমার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

তিনি রমার মাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলে পর রমার মাতা অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন।

সম্মত না হইয়া তিনি কি করেন? তিনি বুঝিলেন অর্থব্যয় করিতে না পারিলে মনের মত পাত্র মিলিবে না। অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে মেয়ে বড় হইয়াছে, বিয়ে না দিলেই নয়? লোকে নিন্দা করিতেছে। তিনি অসহায় বিধবা, কি করিবেন? কাযেই তাঁহাকে নিত্যানন্দ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল! পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পক্ষের পাত্রের হস্তে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা অলোকসামান্য-রূপবতী কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন, সমাজের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ-বর্ষীয়া পাত্রী, কি সুন্দর মিলন! নিত্যানন্দ বাবু বিবাহ করিয়া, রমাকে লইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থল এলাহাবাদে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ নবপত্নী লইয়া শুষ্কহৃদয়ে নূতন প্রণয় স্থাপন করিয়া ঘর করিতে লাগিলেন।

ঘটনাচক্রে কিছু দিন পরে প্রফুল্ল-কুমারও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিলেন।

(৭)

প্রফুল্লকুমারের পীড়া যখন বড় বাড়া বাড়ি—শোচনীয় অবস্থা, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আনন্দ বাবুর বাসায় বিজয় আসিয়া দেখা দিলেন। বিদেশে রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া বন্ধুহীন স্থানে বিজয়ের মত বন্ধুকে পাইয়া প্রফুল্ল যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহার সেই রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্তে বহুদিবস পরে আজি হাসি দেখা দিল।

আনন্দ বাবু ও সুকুমারীর মুখে বিজয় সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া প্রফুল্লের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। প্রফুল্লের হাত দুইখানি ধরিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভাই! তুমি হিন্দুসন্তান! হিন্দুর পিতামাতা অপেক্ষা গুরু আর কেহ নাই। হিন্দুশাস্ত্রে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র পিতার সত্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পরশুরাম পিতার অজ্ঞাক্রমে মাতার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তুমিও সেই হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভাই! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই প্রকার গরিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করা

পরম শ্লাঘনীয় মনে করিয়া থাকি। তুমি হিন্দুসন্তানের উপযুক্ত কার্যই করিয়াছ, পিতার আজ্ঞাক্রমে বিবাহ করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। তবে আর বৃথা কেন ভাই পরস্ত্রীর চিন্তা করিয়া নিজের শরীর মাটী করিতেছ ও পিতা মাতার মনে কষ্ট দিতেছ? বিবাহ করিয়াছ, নিজের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি ভাল বাসা অর্পণ কর, হৃদয়ে সুখশান্তি আনয়ন কর।" প্রফুল্ল একটু ম্লান হাসি হাসিলেন, বলিলেন "ভাই সুখশান্তি আমার এ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। জানি না, বাবা কেন আমার বিবাহ দিয়াছিলেন? যত দিন বিবাহ করি নাই, তত দিন বেশ ছিলাম। ঠাকুরমার কাছে উপকথা শুনিয়া তখন কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি! চাঁদের আলো দেখে, পাখীর গান শুনে, কত সুখ পেতাম। তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াইয়া গল্প করিয়া কত শান্তি পেতাম। কিন্তু সে দিন আর নাই বিজয়! সে দিন আর ফিরিবে না। এখন এ জীবন গেলেই মঙ্গল?"

প্রফুল্লের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া বিজয় বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন "তুমি এমন কথা বল্‌তে পার না প্রফুল্ল! ছিঃ পিতার একমাত্র সন্তান তুমি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! পিতা মাতার নয়নমনি, এ কথা বলা তোমার শোভা পায় না। সামান্য এক নারীর চিন্তায় দেখ্‌ছি তুমি পিতৃভক্তি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছ"।

প্রফুল্ল বিজয়ের এই মৃদু ভৎর্সনা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "না বিজয়! আমি পিতৃভক্তি বিস্মৃত হই নাই। আমার এ দেহে যতক্ষণ জীবন থাকিবে, পিতা আমার কাছে ততক্ষণ ঈশ্বর স্বরূপ থাকিবেন। বোধ হয় জগদীশ্বরের চেয়ে আমার পিতা আমার কাছে অধিক বরেণ্য! আমার প্রাণ থাকিতে আমি কখনো পিতার মনে কষ্ট দিব না। আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই রমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু পিতার অনভিমতে কোন কার্য্য করিব না বলিয়াই আমি সে কায করি নাই। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে রমার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এ জীবনে তাহা মুছিবার নহে, আমি পিতার আজ্ঞা বলিয়াই কেবল রমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম।

বিজয়। তুমি বিবাহিত, তোমার ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অন্য রমণীর চিন্তা করাও তোমার মহাপাপ। তোমার সেই ধর্ম্মপত্নীকে ভাল বাসিবার চেষ্টা কর।

প্রফুল্ল। ধর্ম্মপত্নীর কথা কি বলিতেছ ভাই? আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। বাবা যদি আমার বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে আমি বেশ থাকিতাম! পিতামাতার চরণে এ জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া হাসিতে হাসিতে এ জীবন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অনুপমাকে

বিবাহ করাই আমার কাল হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছি, ধর্ম্মের অনুরোধে অনুপমাকে ভাল বাসিব, কিন্তু তাহা হইবার নয়, বিজয়! অনুপমার শ্লেষপূর্ণ কথা, তাহার তীব্র তিরস্কার, মর্ম্মভেদী ভৎ'সনা, সর্ব্বদাই আমার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে। অনুপমা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাই বলি, বিজয়! আমার এ জীবন গেলেই মঙ্গল।"

বিজয় শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ও কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "ভাই! এ সংসারে এই নিয়ম। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাকে পায় না! মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় না। এ সংসারে কার কত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, প্রফুল্ল? রমার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, কর্ত্তব্যের পথে চলিতে আরম্ভ কর, তা হলেই প্রাণে শান্তি আসিবে। কর্ত্তব্য পালন রোগ, শোক, দুঃখ সব নিবারণ করিবে।"

প্রফুল্ল আবার মৃদু হাসিলেন। বলিলেন "ভাই! রমাকে আমি বড় ভালবাসি, কিন্তু এ ভালবাসায় লালসা নাই। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, তাহার নির্ম্মল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সরলতাকে ভক্তি করি, তার কোমলতাকে স্নেহ করি। তার দেহ লইয়া ক্রীড়া করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই! মানুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও সমাজের উৎপীড়ন দেখিয়া আমি বড় মর্ম্মাহত হইতেছি।

দেখ ভাই! অর্থ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই চায় না? রমার মত রূপগুণ-যুক্ত লোক-ললামভূত বালিকার দরিদ্রের কন্যা বলিয়া বিবাহ হইল না। তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বংশমর্য্যাদা কিছুতেই মানুষকে বশীভূত করিতে পারিল না। অর্থ নাই বলিয়া কোন ভদ্রসন্তান তাহাকে বিবাহ করিল না। অবশেষে পঞ্চাশবর্ষীয় একজন বৃদ্ধ এই অপূর্ব্ব-সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিল। বৃদ্ধ আর কতদিন এ সংসারে জীবিত থাকিবে। পরে বালিকার দশা কি হইবে? শুধু রমা বলিয়া নহে, আমাদের সমাজমধ্যে প্রতিনিয়তই এই প্রকার ঘটিতেছে। এই জন্যই হিন্দুসংসারে বাল্য-বৈধব্য, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানা-বিধ পাপস্রোত বহিয়া যাইতেছে। তবুও মানুষ বুঝে না? তবুও বাঙ্গালীর চক্ষুরুন্মীলন হয় না।

বিধবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে এই সংসার পরি-পূর্ণ! এই সব পাপের ফলেই আমাদের বাঙালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই জন্যই বাঙালীর গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সকলে কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ দরিদ্রের গৃহে এইরূপ।

বিধাতার রাজ্যে কেন এত অবিচার হয়, ভাই! ইচ্ছা হয় সমাজকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গঠন করি, কিন্তু হায়! একা দুর্ব্বল আমি কি করিতে পারি?"

বিজয় বলিলেন "বেশ বলিয়াছ

প্রফুল্ল! এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করাই মানুষের কর্ত্তব্য। উঠ, হৃদয়ে শক্তি আনয়ন কর, সংসারের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ কর, সমাজের উন্নতিকল্পে জীবন পণ কর। অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। রোগশয্যায় শুইয়া চিন্তা করা রমণীর কার্য্য, পুরুষের নহে।"

বিজয় বন্ধুর হিতার্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন।

বিজয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া ও সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া প্রফুল্ল অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও সুস্থ হইতে লাগিল।

হতাশ প্রেমকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-প্রেমে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে আনন্দ বাবু তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল প্রাণপণে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন হয়, তাহার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রফুল্ল এই বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। স্বয়ং প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিলেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়িতের শুশ্রূষা, পরের উপকার, তিনি যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়কে তিনি আর কখনও কাছ ছাড়া হইতে দিলেন না। বিজয় তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ, হৃদয়ে বল, কর্ম্মে সাহস। বিজয় তাঁহার সর্ব্বস্ব। বিজয়কে তিনি এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে সব অন্ধকার দেখিতেন। বিজয় তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ের জ্যোতি, ধর্ম্ম-পথের সহায়?

অনুপমা অধিকাংশ কাল তাহার পিত্রালয়েই অবস্থান করিত, কখন কখন আনন্দ বাবুর বাটীতে আসিত। প্রফুল্লের সহিত মনের মিল তাহার কখনও হইল না। তাহার গর্ব্বিত স্বভাবটারও কখনও পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার ব্যবহারে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ, কেহ কখনও সুখী হইতে পারিলেন না। চিরদিন তার স্বভাব সমভাবেই রহিল।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্র।

লাহোর।

২রা নবেম্বর ১৮৭৩

প্রিয় উমেশচন্দ্র,

ছুটীতে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তুমি যে চেষ্টা করিয়াছ, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এইরূপ চেষ্টা আমার পক্ষে বিশেষ সন্তোষের কারণ। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা তো দেশ বিদেশে ব্রহ্মনাম প্রচার করিবেনই। কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে ধর্ম্মোৎসাহী ও প্রেমিক ব্রাহ্মমাত্রেই সময়ে সময়ে সত্যরাজ্য বিস্তারের জন্য যত্ন প্রকাশ করেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম কি প্রচারক নহেন? অমৃত পান করিলেই পান করাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা স্বাভাবিক শাস্ত্র, কে ইহা অস্বীকার করিবেন? বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহী হইলে আমি কৃতার্থ হই। এমন সুধামাখা দয়াল নাম যতই ঘরে ঘরে বিলাইবে, ততই আমার প্রাণ তোমরা ক্রয় করিয়া লইবে।

আমি অনেক দিন হইতে বলিতেছি যে, স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এত টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল তদ্রূপ হইতেছে না। মেয়েগুলি ধর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে, যথার্থ উন্নতি লাভ করেন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসি। কেবল কতকগুলি অসার কথা শিখাইয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। এ বিদ্যালয়টী যেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত না হয়। তোমাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি এবং আশাও করি। একটী মণ্ডলীকে যথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে। আর দুই মাস দেখা থাক্, এই দুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টী ভাল হয় এবং আমার মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা কি করিতে পার আমাকে লিখিলে আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি। আপাততঃ তোমার ইচ্ছানুসারে একটী তালিকা পাঠাইতেছি, তদনুসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জানুয়ারী মাসে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। তোমার পরিবারকে এবং আশ্রমবাসী আর আর সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মিস্ কলেট্ বামাহিতৈষিণী সভা সম্বন্ধে রাধারাণীর নামে আমার নিকট এক উৎকৃষ্ট পত্র পাঠাইয়াছেন। আমি উহা পরে পাঠাইব? উহার উত্তর দিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

PURNIA B S.

১৮ই জুন রবিবার প্রাতে।

ধর্ম্মবিষয়ে অচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, কেননা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্য।

এই ঔদাসীন্য দ্বারা এক দিকে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হওয়া, অন্য দিকে অসার মোহে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে প্রতারিত হওয়া। প্রাচীন কালের ঋষিগণের এবং বর্ত্তমান কালের সভ্যতাভিমানীদিগের জ্ঞানের এই তারতম্য।

আমাদিগের শরীরের চক্ষু দ্বারা যাহা

দর্শন করি, তাহা অসার বিষয় দর্শন—পশু-জীবনের ভাব, মৃত্যু। এই চক্ষুর অতীত যে চক্ষু আছে, তাহা না খুলিলে সার জীবনের পথ দেখিতে পাই না। অদৃশ্য আশ্চর্য্য জগতের সকল ব্যাপার সেই চক্ষুর গোচর।

(১) এই চক্ষু কত লোকের খুলে নাই। কত লোকের খুলিয়া পুনরায় নিদ্রিত।

(২) কত লোকের খুলিয়াছে বলিয়া বোধ আছে, কিন্তু বস্তুতঃ নিদ্রিত।

ধর্ম্মরাজ্যে জাগ্রত হওয়া প্রথম কথা, পরে দেখা, চলা, সুধাস্বাদন করা। ঈশ্বর এই জন্য জিজ্ঞাসেন এখনও নিদ্রিত? উৎসবের বিশেষ ঘটনা প্রেরণ ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য।

৮ই জুন রবিবার রাত্রি।

ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও।

১। মানুষের এক অংশ পৃথিবীর, তাহা নশ্বর—কিন্তু আর এক অংশ অমর—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। তাহাই যথার্থ মনুষ্যের প্রকৃতি।

২। ঈশ্বর পূর্ণস্বভাব—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পুণ্যে মানব প্রকৃতির আদর্শ।

৩। মানবপ্রকৃতি কুসুমের ন্যায় বিকসিত হইবে—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পবিত্রতায়।

৪। উন্নতি একদিকে সমঞ্জস, অন্য দিকে অসীম।

৫। চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও অসীম আকাশ দেখিতে চায়; ক্ষুদ্র সীমাতে পীড়িত হয়। আত্মা ক্ষুদ্র হইলেও অনন্ত আদর্শ চায়, সীমাবদ্ধ আদর্শে পীড়িত হয়।

৬। আত্মার ভাবের উন্নতি মনুষ্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু "এই পর্য্যন্ত" কেহ বলিতে পারে না।

ব্যবধান মনুষ্যের আত্মার বিষম শত্রু। মুক্তির অর্থ অমৃতভাব, বদ্ধভাব নহে।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য-প্রকৃতির পূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৯ই জুন সোমবার প্রাতে।

প্রীতি পরম সাধন।

১। প্রকৃত ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রীতি।

২। প্রীতি জ্ঞান ও কার্য্যের প্রাণ ও উন্নতির সাধক।

৩। ঈশ্বর আমাদিগের প্রীতির পাত্র অনেক বার।

(১) তাঁহার ন্যায় সুন্দর পদার্থ কে?

(২) তাঁহার ন্যায় ভালবাসে কে?

(৩) তাঁহার সঙ্গে প্রীতির অনন্ত ফল।

৪। এই প্রীতি জন্মিয়াছে কিনা লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হয়—

(১) বিচ্ছেদে ক্লেশ। (২) মিলনে সুখ এবং নিকটস্থ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা। (৩) প্রিয়ের প্রিয় কার্য্য অকাতরে অনুষ্ঠান, স্বার্থ-বিস্মৃত হইয়া।

৫। ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের ভাব ও কার্য্য।

৬। ঈশ্বর অপ্রেমের প্রতিবন্ধক।

৭। অপ্রেমিকও প্রেমিক হইবে ব্রহ্মকৃপাতে।

"উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রান্তরে॥"

৯ই জুন সোমবার রাত্রি।

১। ধর্ম্মপথ কঠিন না সহজ?

২। কঠিন হইলেও একমাত্র যে পথে পরম ধনলাভ হয়, তাহা কি পরিত্যাগ করা যায়?

৩। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

৪। ধর্ম্মের কঠিনত্বের কারণ ইহার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত পরীক্ষা, বাহ্য ও আন্তরিক।

৫। সংসার-লক্ষ্য ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কঠিন, কারণ তাহারা ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ বহনে ভয় করে।

৬। প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর নিকট ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট বহন অতি তুচ্ছ, এই জন্য ধর্ম্মপথ সহজ।

৭। সাধনের প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিলে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। প্রথমতঃ সাধকের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বীরবেশে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দক্ষিণে ও বামে না হেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

৯। পর্ব্বতারোহণের ন্যায় ধর্ম্মপথা-রোহণের যত শেষ তত মনোরম, শেষ প্রান্ত অনির্ব্বচনীয়।

১০ই জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকাল।

ধর্ম্ম মনে নয়, ভাবে নয়, কার্য্যে নয়, কিন্তু বিশ্বাসে।

২। বিশ্বাস স্বর্গীয় বস্তু, ইহার এক কণার অদ্ভুত ক্ষমতা পার্থিব সমুদায় বলকে চূর্ণ করে, এক কণা বিশ্বাসকে কেহ চূর্ণ করিতে পারে না।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিশ্বাস দ্বারা সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইয়াছে? সামান্য লোকের বিশ্বাসে, একব্যক্তির প্রাণ বিসর্জ্জনে সহস্র প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। বিশ্বাসের আলোককে যে রক্ষা করে, সে আরও অধিক প্রাপ্ত হয়। যে লুকায়িত করে, সে হারায়।

৫। সত্য প্রচার জীবন দ্বারা করিতেই হইবে।

লোকের প্রতিকূলতা তাহার পরীক্ষার জন্য, পরে লোকে চিনিয়া তাহাকে আদরে লইবে। যাহাতে অপ্রেমে বধ করে, তাহাতে দেবতা করে।

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কখন বলিব? যখন এরূপ বিশ্বাসে অবনতিশীল, দুর্গত জীবের সদ্গতি হইবে।

(ক্রমশঃ)

মনীষা।

সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে,

চায়ের শূন্য পাত্রটী নামাইয়া রাখিয়া নবীন মুন্সেফ মহেন্দ্র বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাযটা ভাল হচ্ছে না মনীষা, তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্য কর না, কিন্তু"—

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মনীষা বলিল "কিন্তু আমার জন্য চারি দিকের চিন্তাশীল লোকেদের ভারি দুর্ভাবনা জুটেছে,—না? আচ্ছা, তুমিত হাকিম, একটা নোটিশ বার করে দাও—নির্ভয়!"

"না না দেখ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তুমি, গৃহস্থ ঘরের চালে থাক, কোন আপত্তি নাই"—

স্বামীর অসমাপ্ত কথার উত্তরে মনীষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "বা! আমি কি পথস্থ ঘরের মেয়ের মত চালে আছি?"—

বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া মহেন্দ্র নাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন "নয় কেন? সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, পাড়ায় পাড়ায় যত ছোট লোকদের ঘরে ঘরে বেড়ান, এ গুলো বুঝি বড় ভাল কায? লোকে ভারি সুখ্যাতি করে,—না?

মনীষা দুর্লক্ষণ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল, বিনীত ভাবে বলিল "সকালে আমি বেরুই না।"

"না হোক, সন্ধ্যার পর বেরোও তো? লোকে বল্‌তে ছাড়বে কেন? লজ্জায় আমার মাথা হেট হয় জান? যে আসে, সেই বলে মশাই আপনার স্ত্রী—"

"থাম থাম, তোমার গোটাকতক লক্ষ্মী-ছাড়া উকীল বন্ধু জুটে খোসামোদের তোড়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্চে তা আমি জানি, আমি বড় লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেও যাই না, আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে গল্প কর্ত্তেও যাই না, দু-দশ জন অনাথ গরীবের খবর নিলে কি এত গুরুতর অপরাধ হয় বলত—যে সবাই মিলে অত বিজ্ঞতা ফলিয়ে বাধা দিতে আসেন? সাধে বলি যত অকেযো লোকের আরাম শুধু পরচর্চ্চা চিবিয়ে।—"

মনীষা দুদ্দাড় করিয়া টেবিলের জিনিস গুলা নাবাইয়া, ঝাড়নে করিয়া সপাসপ্ টেবিল ঢাকা ঝাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র নাথ গোঁপে মোচড় দিয়া মিনিট দুই ভাবিলেন, মনীষা সম্বন্ধে বাহির হইতে সংগৃহীত কতকগুলো জবানবন্দ,—মায় টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যা সহ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন, পরে বলিলেন "দেখ পয়সার দ্বারা যতটা পার তুমি গরীব দুঃখীর উপকার কর,—কিন্তু নিজে অমন টো টো করে যেখানে সেখানে ঘুরো না—"

"বাঃ বেশতঃ, তোমার রোজকারের টাকাগুলো ঘুস দিয়ে আমি আরামে বসে

পুঁপি কিন্‌বো ? চমৎকার মীমাংসা তো! —মনীষা আবার হাসিয়া ফেলিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, আমার এই সব ছোট কাযের এত বেশী খোঁজ খবর নিয়ে তোমার কাছে হিতৈষীগণ। যাঁরা ফলাতে আসেন, তাঁরা যে কি রকম নির্লজ্জ আমি শুধু তাই ভাবি!—"

নিজের পক্ষটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনশ্চ নবোদ্যমে অন্য দিক দিয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, মনীষার ও জেদ্ চড়িল। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়া শেষে মনীষা অত্যন্ত রাগিয়া শপথ করিয়া বলিল "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন যাইলেও যদি আর কোন দিন এই ঘরের কোণটা ছাড়িয়া বাহির হই, তা হলে……।"

মহেন্দ্রনাথ ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন দীনে, দীনে—"

কিশোর ভৃত্য দীনুয়া তখন বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা কাগজের পাকান বল ও একটা দেবদারু কাঠের সরু তক্তাভাঙা লইয়া সাহেবদের টেনিস্ খেলার অনুকরণে লোফালুফি করিতেছিল, সহসা প্রভুর আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মহেন্দ্র নাথ তীব্র স্বরে বলিলেন "ফাটা ফের যদি তোমার মাইজীকে নিয়ে কোথাও গেছ শুনি, তা হলে…।"

প্রভুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া দীনুয়া বুঝিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাঠী ও লণ্ঠন লইয়া মাইজীর সহিত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে যাওয়ায় একটা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে!—সে ভয়ে ভয়ে এক বার আড় চোখে মনীষার পানে চাহিল, কিন্তু মনীষা তখন তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের ফুলদানীতে কতকগুলা সপল্লব ফুটন্ত হাস্নুহানা সাজাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দীনু কর্ত্রীর নিকট কোন আদেশ ইঙ্গিত না পাইয়া, অগত্যা প্রভুর বাক্যের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া বাহিরে আসিল। ইঃ! আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল যে, অকারণ মনীবের কাছে ধমক খাইল!—

যাহাকে দশ কথা শুনান যায়, সে যদি দুকথা না জবাব দেয়, তাহা হইলে তাহা যেন বাতাসের সহিত মল্লযুদ্ধের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ হাস্য বিদ্রূপের ধারে মনীষা স্বামীর কথা কাটিতেছিল, ততক্ষণ স্বামী খুব নির্ভাবনাতেই কথা চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষটা নিজের অত্যধিক রূঢ়তার দোষে প্রতিপক্ষের অবস্থান্তর ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার কেমন দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হইল। কিন্তু তখন হঠাৎ থামিয়া গেলে নিতান্তই পরাজয়ের মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ খুব জোরের সহিত আপনাকে ঠিক রাখিয়া নিঃশব্দে কার্য্যে রত স্ত্রীকে আরও গোটা-কতক শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া, সশব্দে দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ।

কুকুরের কামড়ান। (দেও কুকুর ও শেয়ালের জন্ত—গৃহপালিতের জন্ত নহে) সাদা অপরাজিতার বীজ ১টা ও ৩টা গোল মরিচ বাটিয়া (বার বৎসরের কম বয়সের অর্দ্ধ মাত্রা) তিন দিন প্রাতঃকালে সেবনীয়।

২। দুই দিন অন্তর পালা জ্বর—নাটার বীজ ও পিপুল (১ তোলা করিয়া) ও বাবলা পাতা (অর্দ্ধ তোলা) জলে বাটিয়া, ভিজে ছোলার মত বটি করিয়া দিনে তিন বার (বালকের অর্দ্ধ মাত্রা) বিজ্বরের দিন সেবা। পথ্য একটু দুগ্ধ। আরোগ্য হইলে ১টা করিয়া গুলি ২।৩ দিন ধরিয়া দিবে।

৩। গ্রহণী, রক্তামাশায়, শ্বেতামাশায় ও ডায়ারিয়ায়—এক ছটাক জাঙ্গী হরিতকী, অর্দ্ধ ছটাক আমলকী কাটখোলায় ভাজিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিবে। পরে গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া (ময়ান দেওয়ার পর) কাশীর চিনি ১৷৷০ ছটাক মিশ্রিত করিবে। ।/০ ওজন পূর্ণ মাত্রা (দিনে দুই বার)। পথ্য জলমিশ্রিত বা খাঁটি দুগ্ধ।

৪। পৃষ্ঠব্রণ।—জল না ছুঁয়ে কাঠা-নোটের শিকড় তুলিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ঘায়ের মুখে গুঁজে দিলে পুঁয বা টানিয়া বাহির করে। কাঁটানটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল ফোড়াই কাটিয়া যায়। অস্ত্র করিতে হয় না।

৫। দাঁতের পোকার যন্ত্রণা—রোগী চিকিৎসক দুজনেই জল না ছুঁয়ে আফুলা আপাংএর শিকড় তুলিয়া কাপড়ে পুঁছিয়া দাঁতে ছপটির মত মারা। উহাতেই সারিবে।

৬। ঘুংড়ি কাশি। (১) এক ঝিনুক ব্রাহ্মী শাকের রস উষ্ণ করিয়া, কিম্বা ইষেণমুলের রস এক ঝিনুক খাওয়াইলে এক দিন বা দুই দিনেই সারিবে।

বালকের আদার রস ও মধু, দিনে ৪।৫ বার।

৭। সাধারণ কাশি। এক তোলা আদার টুকরা ও এক তোলা মিছরি, দিনে ৫।৬ বার। তিন দিন স্নান বন্ধ।

৮। দু আনা শুঁটের গুড়া এক ধান কর্পূর ও দুটা গোলমরিচ গুড়া, দিনে ৪।৬ বার। তিন দিবস স্নান বন্ধ।

৯। শুষ্ক কাশি। তালের মিছরি অনবরত মুখে রাখিবে, অথবা যষ্টি-মধুচুর্ণ ও মিছরি চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া মুখে রাখিবে। স্নান করিবে। (উদ্ধৃত)

নূতন সংবাদ।

১। গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের অন্যতম লেখক

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের সময় "লুসিটেনিয়া" নামক জাহাজ ডুবি হইয়া কোন্ অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের পাঠিকারা অনেকেই ইন্দুপ্রকাশের রচনা পাঠ করিয়াছেন। তিনি একজন সুলেখক ও উৎসাহশীল যুবক। সংসারের শত বিঘ্ন বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সুদূর আমেরিকায় জ্ঞান উপার্জ্জনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে এই বিপদ সংঘটিত হয়। স্বদেশে ফিরিবার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যে জাহাজে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে জাহাজ অপেক্ষা "লুসিটেনিয়ায়" আসিলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারিবেন এই শুনিয়া পূর্ব্বের জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই আরোহণ করেন। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে? বাড়ী আসিবার জন্য যে প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়াছিল, সে আর এ জীবনে যে ফিরিয়া আসিবে তাহা আশাতীত। ইন্দুবাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃদ্ধা জননী, তিনটী শিশু সন্তান, পত্নী ও আত্মীয় স্বজন এই নিদারুণ সংবাদে কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। তিনি এই শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল।

গুণানুসারে।

প্রথম বিভাগ।

১। আইরিন্, ডি, এম, সি ব্লগু—লোরেটো হাউস
২। রায় সুনীলা—বেথুন
৩। সেন জ্যোৎস্নাময়ী—"
৪। আইরিন, ভারডন্—নন্‌কলেজিয়েট
৫। দত্ত সুধাময়ী—বেথুন
৬। মেবল জোহানস্—নন্‌কলেজিয়েট
৭। লিলিয়ানুটরে— "
৮। জিভারাথানাম এণ্টনী—ডাওসেসন
৯। দাসগুপ্ত স্বর্ণপ্রভা—বেথুন
১০। এডিথ ষ্টিভেন্স—নন্‌কলেজিয়েট
১১। অ্যানিক্রুপ—ডাওসেসন
১২। রায় মনীষা—বেথুন
১৩। ডোরিস মেকন্—নন্‌কলেজিয়েট
১৪। দাস, লাবণ্য লতা— "
১৫। দ্বিজবালা—" "
১৬। ভট্টাচার্য্য উষা—লরেটো হাউস
১৭। কিংসলি ক্যামেলিন—নন্‌কলেজিয়েট
১৮। সাহা, হর্টেনস্ মেরিয়েন্স—ডাওসেসন,
১৯। গারেট্ কন্‌ষ্টান্স—নন্‌কলেজিয়েট

২০। লিলিয়ান ভোয়া—লোরেটো-হাউস
২১। কোর্টগার্ট্রুড—নন্‌কলেজিয়েট

দ্বিতীয় বিভাগ।

২২। বরজেস্ লিজি—লরেটো হাউস
২৩। চৌধুরী প্রেমলতা—বেথুন
২৪। ক্রু, ইউনিফ্রেড—লরেটো হাউস
২৫। দাস নলিনী বালা—বেথুন
২৬। ঘোষাল পূর্ণিমা— ”
২৭। গ্রেস্ রেনার—নন্‌কলেজিয়েট
২৮। লিয়ার ফ্লোরেন্স, এল,— ”
২৯। মণ্ডল, লীলাবতী— ”
৩০। নায়ক, নিশীবালা—ডাওসেসন
৩১। পাণ্ডে, বসন্তকুমারী—বেথুন
৩২। রায়, শান্তশীলা—ননকলেজিয়েট।
৩৩ হেমবালা—বেথুন
৩৪। সোম সুনীতিবালা—নন্‌কলেজিয়েট
৩৫। টারগেট বিট্রাইস— ”

তৃতীয় বিভাগ।

৩৬। দাসগুপ্তা প্রভাবতী—”

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

পশ্চিম বাঙ্গালা।

আইরিস ব্লণ্ড—২৫৲ লরেটো
সুশীলা রায়—২০৲ বেথুন
সুধাময়ী— ” ”
জিভায়াথানাম এন্টনী—ডাওসেসন
অ্যানি ক্রপ·· ”

পূর্ব্ববাঙ্গালা।

জ্যোৎস্নাময়ী সেন—২৫৲ বেথুন
স্বর্ণপ্রভা দাস গুপ্তা—২৫৲ বেথুন

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

১। ব্যানার্জ্জি—মাধবিকা, বেথুন
২। চিত্রলেখা, ব্রাহ্ম গার্লস
৩। ”—ডলি, ডাওসেসন
৪। বড়ুয়া—রাজবালা, বেথুন
৫। বসাক—ইন্দিরা, রাভেন্সগার্লস
৬। বসু—মুক্তি, ব্রাহ্ম গার্লস
৭। ভৌমিক—মালিকা ”
৮। বিশ্বাস—প্রীতিকণা, ছোট নাগপুর গার্লস
৯। চক্রবর্ত্তী—চারুলতা, বিদ্যাময়ী
১০। চট্টোপাধ্যায়—নিরুপমা, ঢাকা ইডেন
১১। দত্ত—রেণুকা, দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল
১২। গাঙ্গুলী—জয়ন্তী, বেথুন
১৩। ঘোষ—বেলা, ভুলাসার
১৪। ” —লীনা, ডেওসেসন
১৫। গুহ—নিহারবালা, চাটগাঁও বালিকা।
১৬। হালদার—সরল প্রভা, ডাওসেসন
১৭। মৈত্র—কমলা, ব্রাহ্ম গার্লস
১৮। মজুমদার—সুমতি, চট্টগ্রাম
১৯। মিত্র—শৈবলিনী ব্রাহ্মবালিকা
২০। নন্দী—বিমলা, বেথুন
২১। রাও—শকুন্তলা, ব্রাহ্ম গার্লস
২২। রায়—সুপ্রভা, বিদ্যাময়ী
২৩। নেজমা রসুল—লোরেটো হাউস

দ্বিতীয় বিভাগ।

আচার্য্য—সরোজিনী

২৪। ব্যানার্জ্জি—অনীমা, ক্রাইষ্টচার্চ

২৫। বসু—সিরোজ নলিনী বেলা অদেশ প্রবাল

২৬। ঘোষ—তরুলতা, প্রাইভেট

২৭। ”—সুপ্রভা, ডাওসেসন

২৮। গুহ—পুণ্যপ্রভা, প্রাইভেট

২৯। কোয়ার—লাছী বাই, ব্রাহ্ম-গার্লস

৩০। মুখার্জ্জি—নীহারযামিনী ক্রাইষ্ট চার্চ।

৩১। রায়—গিরীন্দ্রবালা, ডাওসেসন

৩২। ”—কান্তবালা, গার্ডিনার মেমোরিয়াল

৩৩। ”—ছোট নাগপুর

৩৪। সেন—শান্তিবালা, বেথুন

৩৫। সিংহ—প্রেমসুধা, ব্রাহ্মবালিকা

৩৬। সুকুল—জয়ন্তি, বেথুন

তৃতীয় বিভাগ।

৩৭। দে—মৃণালীনী, প্রাইভেট

৩৮। দত্ত—বিনোদিনী, ব্যারাকপুর মিশন

৩৯। সিংহ—রমোলা, ব্রাহ্ম গার্লস

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

বালিকাদের মধ্যে প্রথম

চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৲

দ্বিতীয়

কুসুম কুমারী সেন ১৫৲

শকুন্তলা রাও—২০৲

মাধবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫৲

নেজলা রসুল—১৫৲

বিমলা নন্দী—”

নীহারবালা গুহ—২০৲

পূর্ব্ববঙ্গের বৃত্তি।

সুপ্রভা রায়—২০৲

নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়—”

চারুলতা চন্দ—„

রেণুকা দত্ত—„

মিনতিবালা আচার্য্য—”

কমলকুমারী মৈত্র ২০৲

মুক্তি বসু ১৫৲

বামারচনা।

বিপত্নীকের পত্নীমিলন।

শুন যত সভাজন বল হরি বোল
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়ল হাসির রোল।
সত্তর বর্ষ বয়স হল গিন্নী গত তার,
বিয়ের তরে বুড়ো পাগল খোঁজে পরিবার।
গিন্নী গত, গৃহশূন্য, ছনিয়া অন্ধকার,
ভাবে বুড়ো কবে পাব, বনিতা আবার।
তিন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, আর
জামাতা দুহিতা দিয়ে পূর্ণিত আগার।
সে সকলে নাইক মন ভাবে নিশিদিন,

কোথায় পাব পত্নী হবে কবে শুভদিন।
তার পরেতে বিধির লীলা শুন চমৎকার,
বিজ্ঞাপনে নজর পড়ে একদিন বুড়ার।
সুদূর পল্লীতে এক কুলীন ব্রাহ্মণ
তাহার ঘরে আছে কন্যা কুমারী তিন জন।
পঞ্চাশ বড়র বয়স, মেজটি তিরিশ,
কনিষ্ঠা যে কন্যা, তাহার বয়স হল বিশ।
অর্থাভাবে পিতা তাদের করেনিক দান,
করুন বিয়ে, যদি কেহ শুধু কন্যা চান।
বিজ্ঞাপন দেখে বুড়ার নেচে উঠল প্রাণ,
এত দিনে বুঝি দয়া করলেন ভগবান।
হারা নিধি পেলে লোকের যে আনন্দ হয়,
শুভ খবর পেয়ে বুড়োর তেমি সুখোদয়।
পাঠিয়ে তাদের রাহাখরচ তড়িৎ-যন্ত্র-যোগে
হেথা বুড়ো লেগে গেল বিবাহ উদ্যোগে।
প্রয়াগ ধামে কন্যা এলে করবে বিয়ে তায়,
আনন্দেতে বুড়োর দেহে যুবার শক্তি বয়।
তার পরেতে আরো মজা শুন চমৎকার,
তিনটি মেয়ে নিয়ে হাজির জনক কন্যার!
বড়টিরে সমর্পিতে পিতার প্রাণ চায়,
কনে দেখে জলে গেলেন পাত্র মহাশয়।
প্রৌঢ়া মেয়ে বিয়ে করতে তিনি রাজী নন,
তিরিশ যে তারি তরে ব্যাকুলিত মন।
কনের বাপ বলে শুন, পাত্র মহাশয়
বড় রেখে ছোটর বিয়ে সে ত নাহি হয়।
ঝগড়া ঝাঁটি কাজ নাইক হিত কথা কই,
শুভ লগ্নে বিয়ে কর বড়, মেজ, দুই।
ব্যাপার দেখে ভাবে বুড়ো এত মন্দ নয়
একটা গিয়ে দুটা হ'ল ভাগ্য পরিচয়।
বড় গিন্নী দাসী রূপে থাকবে গৃহে মোর,
ছোট নিয়ে আনন্দেতে থাকব আমি ভোর।
রান্না বান্না কাজ কর্ম্মে দিন নাক তায়,
এই না ভেবে বিবাহেতে দিল বুড়ো সায়।
ফাল্গুনে শুভ তিথিতে মলয় মধুর বয়,
সেজে গুজে চল্ল বুড়ো বিবাহ সভায়।
ছাঁদলা তলায় বর দাঁড়াল বলিহারি যাই,
চুলে কলপ তোবড়া গালে দাঁতের বালাই
নাই।
দুই কন্যা বরণ হল চোদ্দ পাক দিয়ে,
এক সঙ্গে মন্ত্রপূত করে নিল দুয়ে।
বিয়ে করে ছোট নিয়ে পাল্কি চড়ে যায়,
বড় চল্লেন দাসীরূপে, কে দেখে তাহায়।
পথের মাঝে দেশের যত নব্য ছেলের দল
সঙ্গে সঙ্গে চল্ল সবে বাজিয়ে কর্ত্তাল খোল।
তার পরেতে ফুলশয্যা শুন সভাজন,
ঘর বিছানা সাজাইতে দিল বুড়ো মন।
দেশের যত যুবকবৃন্দ দিয়ে মালা ফুল
বুড়োয় দিল সাজাইয়ে বল হরিবোল।
বুড়ো মড়া মলে যেমন সাজায় তারে সবে,
সাজিয়ে তেমি হরি হরি বলে উচ্চ রবে।
বল হরি, হরি বোল, বল হরি বোল,
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়্‌ল হাসির
রোল।

শ্রীনীরদবরণী দেবী।

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।



ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।